অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

সংকেত রহস্য



সংকেত রহস্য

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

পত্র ভারতী

আয়ারল্যান্ডের শস্যখেতে হঠাৎই দেখা গেল ছোট-বড় বৃত্তের জটিল নকশা। একই নকশার সঙ্কেত পেল পোর্টোরিকোর অ্যারেকিবো টেলিস্কোপ—দূরের এক তারা থেকে শুরু করে আমেরিকার সদ্য-আবিষ্কৃত এক গুহার দেওয়ালেও লক্ষ বছর আগে লেখা একই সংকেত। হঠাৎ্‌ পেরুর একটি উপজাতির জনসংখ্যা কমতে শুরু করল। আমাজনের জঙ্গলে দেখা গেল অতীতের অনেক বিলুপ্ত জীব—ড্রাগন, কোয়াগ্যা, ডাইনোসর। রহস্য উদ্ধারে পেরু সরকারের তৈরি টিমে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দিল অনিলিখা। কী আছে এই সংকেতে? কেনই-বা বারবার একই সংকেত? কে পাঠাচ্ছে? এ পৃথিবীর কেউ কি এ-সংকেত বুঝতে পারে? চরম কিছু কি ঘটতে চলেছে পৃথিবীতে?

সাল ২০৫১। জ্ঞান ফিরতে ঋক দেখল ও শুয়ে আছে কলকাতার এক পার্কে। হারিয়ে গেছে শেষ কয়েক ঘণ্টার হিসেব, আর ওর আই-ডি কার্ড। একই চেহারার হাজার-হাজার মানুষের যুগে এই আই-ডি কার্ডই পরিচয়ের একমাত্র ভরসা। সেই পরিচয় হারিয়ে ঋকের চ্যালেঞ্জ নিজেকে ঋক হিসেবে প্রমাণ করার। এরই মধ্যে সীমানা পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছে কুখ্যাত টেররিস্ট ডিসিলভা—যার চেহারা ঋকেরই মতো। ডিসিলভা শুধু জানে যে, সে একটা মারাত্মক মিশনে এসেছে। কিন্তু কী সেই মিশন? কেন তার মনে পড়ছে না ভারতে আসার পরের কয়েক ঘণ্টা?

‘সংকেত রহস্য’ ও ‘রহস্য যখন নিজেকে নিয়ে’—দু-দুটো কল্পবিজ্ঞান রহস্য উপন্যাস দু-মলাটে বন্দি।

সংকেত রহস্য

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

সংকেত রহস্য



পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ আগস্ট ২০১১
তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৪

SANKET RAHASYA
by
Abhijnan Roychowdhury

ISBN 978-81-8374-069-2

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুদীপ্ত দত্ত

মূল্য
১০০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail patrabharati@gmail.com *website* www.bookspatrabharati.com
visit us at www.facebook.com/ Patra Bharati
Price ₹ 100.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

বিজ্ঞানের রূপকথা হল কল্পবিজ্ঞান। তবে এই রূপকথাকে হতে হবে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে মোড়া। অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী লেখে বুদ্ধিদীপ্ত কল্পবিজ্ঞানের গল্প। তার উপন্যাসগুলো এতটাই এই শর্ত পূরণ করে যে অদ্ভুত এক মায়াজালে আচ্ছন্ন হতে হয়। সে কল্পবিজ্ঞান আজ অভিজ্ঞানের কলম থেকে বেরুচ্ছে তা আগামী কিছু বছর পর হয়তো সত্যি হবে।

অভিজ্ঞানের লেখা প্রথম আমার নজরে আসে সম্ভবত ১৯৯০ সালে কিশোর ভারতীতে। তখন ওর খুবই অল্প বয়েস। কিশোর ভারতী পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে যুক্ত হওয়ার সুবাদে ওর পাণ্ডুলিপি পড়তে গিয়ে চমকে উঠেছিলাম। লেখা মনোনীত হয়েছিল এবং সাধারণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পড়েই আমার মনে হয়েছিল অন্যান্য কল্পবিজ্ঞানের লেখার থেকে ওর লেখা কোথাও একটু আলাদা। অভিনব বিষয় নির্বাচন, অসাধারণ পর্যবেক্ষণ, সুচারু বিশ্লেষণ এবং অত্যন্ত সহজভাবে তার বর্ণনা—এই দুরূহ কাজ সহজাত দক্ষতা না থাকলে সম্ভব নয়।

আমি ওর লেখার একনিষ্ঠ ভক্ত। আর তাই ওর নাছোড়বান্দা অনুরোধে জীবনে প্রথম কোনও বইয়ের ভূমিকা লিখতে বাধ্য হচ্ছি। যারা কল্পবিজ্ঞানের লেখা পড়তে ভালোবাসেন, তাঁরা তো পড়বেনই, কিন্তু যারা বাসেন না—তাদেরও অনুরোধ করব একবার এই মায়াজালে আচ্ছন্ন হতে। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ভালো লাগবেই।

অভিজ্ঞানের আরও অনেক লেখায় আমাদের সাহিত্যের কল্পবিজ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হোক, এই শুভকামনা রইল।

১২ জানুয়ারি ২০১০

চুমকি চট্টোপাধ্যায়

লেখকের অন্যান্য বই

গ্লোবাল ওয়ার্মিং

একের পিঠে দুই

সংকেত রহস্য

রহস্য যখন নিজেকে নিয়ে



সংকেত রহস্য

॥ পোর্টেরিকো, আমেরিকা 16 এপ্রিল ॥

ভোর পাঁচটা। অ্যারেকিবো টেলিস্কোপের ওপরের একটা লোহার প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে হাঁটছিলেন জিল টার্টার। জিল 'সেটি' বা সার্চ ফর একস্ট্রাটেরেস্টিয়াল ইনস্টিটিউটের ফিনিক্স প্রজেক্টের ডিরেক্টার। জিল আর জিলের টিমের কাজ তারাদের কথা শোনা। অর্থাৎ বহির্বিশ্ব থেকে কোনও সংকেত আসছে কি না তা লক্ষ করা। পৃথিবীর বৃহত্তম এই টেলিস্কোপে খুব দুর্বল সিগন্যালও ধরা পড়ে। গত কুড়ি বছর ধরে জিলের এই কাজ। তবে এখনও অবধি বহির্বিশ্বের কোনও সংকেত ধরা পড়েনি এই বিশাল টেলিস্কোপে।

তবু জিলের এই কাজ খুব ভালো লাগে। প্রত্যেক মুহূর্তেই মনে হয় এই বুঝি এল কোনও সংকেত। আর আশা করাটা কি খুব ভুল! মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই আছে 400 বিলিয়ন তারা। তার মধ্যে দশ শতাংশ সূর্যেরই মতো—আকারে-বয়সে। মহাবিশ্বে এরকম 100 বিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে। তাই প্রাণ নিশ্চয়ই আছে আরও কোথাও। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুধু সময়ের অপেক্ষা।

রোজ এই সময়টাতে দশ-পনেরো মিনিটের জন্য বাইরে এসে দাঁড়ান জিল। বিশাল টেলিস্কোপের মাথার ওপরের এই প্ল্যাটফর্মটায়। টেলিস্কোপের চারদিক ঘিরে ঘন জঙ্গল। প্রকৃতির মাঝেই প্রযুক্তি। ঘন কুয়াশার চাদর ভেদ করে পুবের দিকে সূর্যোদয়ের রক্তাভা দেখা যাচ্ছে। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করলেই জঙ্গলের সুর কেমন যেন বদলে যায়। দূরে গাছে কোকুই ব্যাঙের সমবেত ডাক শোনা যায়—'কোকুই, কোকুই'! অদ্ভুত এই ব্যাঙ। ডাক শোনা যায়। কিছু কখনও দেখা যায় না। টেলিস্কোপের উপরের স্টিলের তারে বসা পাখিদের ডানা ঝাপটানো শুরু হয়েছে। হঠাৎ তার সঙ্গে আজ এক বেসুরো আওয়াজ যোগ হল। সেলফোন বাজছে।

দিনের বেলায় সূর্যের বদান্যতায় রেডিও সিগন্যাল বিকৃত হয়ে যায়। তাই টিম রাতের বেলা কাজ করে তারাদের ওপর নজরদারি করার। সন্ধে ছ'টা থেকে সকাল ছ'টা হল কাজের সময়। তাই এসময় ফোন বাজাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ফোনের নাম্বারটা অস্বাভাবিক। ল্যাবের কম্পিউটার থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা

ফোন। এই ফোন জিল গত কুড়িবছরে মোটে ছ'বার পেয়েছে।

অ্যারেকিবো টেলিস্কোপের সঙ্গে যুক্ত কম্পিউটার মহাকাশের কোনও জায়গা থেকে ন্যারো ব্যান্ড সিগন্যাল পেলে তা সঙ্গে-সঙ্গে ইংল্যান্ডের আরেকটা টেলিস্কোপকে জানায়। ওই টেলিস্কোপ সঙ্গে-সঙ্গে দেখে আকাশের ওই দিক থেকে সত্যিই কোনও সংকেত আসছে কি না। দু-জায়গায় দুটো টেলিস্কোপ একসঙ্গে নিশ্চয়ই ভুল দেখবে না! দ্বিতীয় টেলিস্কোপও ওই সিগন্যাল পেলে কম্পিউটার অ্যারেকিবো টেলিস্কোপকে অভিমুখ সামান্য পরিবর্তন করতে বলে। যদি অভিমুখ পরিবর্তনের জন্য সিগন্যাল চলে যায়, আর আবার আগের পজিশনে মুখ ঘোরালে ফিরে আসে তবে তা এটাই প্রমাণ করে যে, আগে টেলিস্কোপ যে-তারার দিকে নির্দেশ করেছিল তার থেকে সংকেত পাচ্ছে। এর পরই কম্পিউটার 'সেটি' টিমের সবার কাছে ফোন করে মেসেজ পাঠিয়ে দেয়।

এসবের পরেও গত কুড়িবছরে জিল যে ছ'বার ফোন পেয়েছে, প্রত্যেকবারই ভুল সংকেত ছিল। শেষবার একটা স্যাটেলাইট থেকে ভুল সংকেত পেয়েছিল। তবু এই সংকেতের জন্যই জিলের আজীবন প্রতীক্ষা। ছুটে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে অবজারভেশন সেন্টারে ঢুকতে জিলের সময় লাগল মোটে পাঁচমিনিট। অন্যরাও জড়ো হয়েছে কম্পিউটারের সামনে।

পাশ থেকে হেনরি বলে ওঠে,—ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট ল্যাসেনের টেলিস্কোপেও এই সিগন্যাল এক্ষুনি ধরা পড়েছে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য চার মিলিমিটার। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গদৈর্ঘ্য।

জন বলে ওঠে,—নিশ্চিতভাবে কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। সংকেতটা আসছে তারা HD214 825 0AB থেকে। এ-তারাটা আমাদের সূর্যেরই মতো। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতেই।

বলতে-না-বলতে কম্পিউটার মনিটরে একটা বৃত্ত ফুটে ওঠে। তারপরে আরেকটা। আস্তে-আস্তে পুরো নকশা ফুটে ওঠে। জিল অস্ফুটে বলে ওঠে,—ও মাই গড! এটা কী নকশা?

॥ লিমা, পেরু 18 এপ্রিল ॥

আপনার কি মাথার ঠিক আছে ডক্টর গেরার্ডো? এ রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী কাস্টেলোর কাছে গেলে আমার-আপনার চাকরি থাকবে?

নানান ধরনের চার্ট, ছবি আঁকা রঙিন রিপোর্টটা ছুড়ে দিয়ে গার্সিয়া চেঁচিয়ে উঠলেন। গার্সিয়া পেরুর মানবসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী।

—কিন্তু রিপোর্টটায় কোনও ভুল নেই। আমি না বললেও খবরটা ঠিক ছড়িয়ে পড়বে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন উপজাতি প্রধান আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। এই 'অ্যামাহুয়াকা'-দের কথাই ধরুন। দু-বছর আগেও দুশো ছিল সংখ্যায়। এখন তারা ভ্যানিশ। 'অ্যাশানিন্‌কা'-দের সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার, এখন সেটা আট হাজার। 'অ্যাশুয়ার' ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার, এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার। ডক্টর গেরার্ডো রিপোর্টটায় একবার চোখ বুলিয়ে নেন।

—তা কোনও উপজাতির সংখ্যা বাড়েনি?

—হ্যাঁ বেড়েছে। বোরা ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা সামান্য বেড়েছে।

গার্সিয়ার পাশেই বসে আছেন মানবসম্পদ দপ্তরের সেক্রেটারি অ্যারন। রিভলভিং চেয়ারটা টেবিলের দিকে একটু টেনে এনে বলে উঠলেন,—গেরার্ডো, আপনি তো এখানকার রাজনৈতিক অবস্থাটা বুঝতে পারছেন। এমনিতেই আমাজনের জঙ্গলে তেলের পাইপলাইন বসানো নিয়ে হইচই হচ্ছে। নানা দেশের আবহাওয়াবিদেরা সুর ধরেছেন এর জন্য নাকি আমাজন ধ্বংস হয়ে যাবে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বেড়ে যাবে। পরিবেশ পরিবর্তনের জন্য উপজাতিরা উধাও হয়ে যাবে। এসবের মধ্যে যদি আবার এ-খবর বেরোয় তাহলে আর দেখতে হবে না। আমাদের সরকার যে-ক'টা তেল আর গ্যাসের কন্ট্র্যাক্টে সই করেছে, সবক'টা বাতিল করতে হবে।

গার্সিয়া আবার শুরু করলেন,—তা কী কারণ হতে পারে বলে আপনার মনে হয়? জঙ্গল কাটার জন্য এরা তো আর উবে যাবে না।

—সেটাই রহস্য। আর, এই যে বললাম উপজাতিদের সংখ্যা কমে যাওয়া—এটা কিন্তু সব উপজাতির মধ্যে নয়। মূলত আমাজন বেসিনের জঙ্গলে যেসব উপজাতিরা থাকে তাদেরই সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। আর এই কমে যাওয়ার ব্যাপারটা বিশেষ করে লক্ষ করা গেছে গত দু-বছরে।

—উপজাতি প্রধানদের তো তা জানা উচিত। তারা কী বলছে?

—বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওদের ভাষা বোঝাটাই সমস্যা। অ্যাশনিন্‌কা ইন্ডিয়ানদের চার-পাঁচজন প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছি। হঠাৎ-হঠাৎ করে এদের দলের লোকেরা ইদানীং উধাও হয়ে যাচ্ছে। হয়তো কেউ মাছ ধরতে গিয়েছিল, কেউ কাঠ কাটতে গিয়েছিল, ব্যস আর ফেরেনি।

গেরার্ডোকে থামিয়ে গার্সিয়া বলে ওঠেন,—তবেই বুঝুন? নির্ঘাত জাগুয়ার, অ্যানাকোন্ডার সংখ্যা বেড়ে গেছে। হবে না, শুধু জঙ্গল-জঙ্গল করলে! তাদের পেটেই যাচ্ছে এরা।

—কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে অন্তত ডেডবডির চিহ্ন পড়ে থাকে। ওরা কিছুই

খুঁজে পায়নি। যারা হারিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন ফিরে এসেছে। কিন্তু তাদের নাকি ভূতে ধরেছে। ফেরার পর কাউকেই তারা আর চিনতে পারে না। চিকিৎসা করেও সারানো যায়নি।

—ওরা আবার কী চিকিৎসা করায়! নিয়ে তো যায় ওদের হাতুড়ে ডাক্তারদের কাছে। তা আপনি কি ওরকম ভূতে-ধরা কারও সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন?

—না, সে চান্স আমার হয়নি। তবে শুনেছি এরা নাকি বাড়ির লোকজন কাউকে চিনতে পারছে না। এমনকী, আগুন, জন্তু-জানোয়ার—এসবের ভয়ও এদের চলে গেছে।

—আপনার কাছেই এসব যখন রহস্য, তখন এগুলো রিপোর্টে না লেখাই ভালো। তার থেকে আপনি বরং একটা টাস্ক কমিটি তৈরি করুন। তাতে ভালো কয়েকজন বিজ্ঞানী রাখুন। আর কয়েকজনকে রাখুন যারা ওই উপজাতিদের ভালো বোঝে। আমাজনের অন্ধিসন্ধি জানে। তারপরে সেই টাস্ক কমিটির মতামত অনুযায়ী না হয় যা কিছু দরকার, তা করা যাবে। অ্যারন বলে ওঠেন।

ডক্টর গেরার্ডো সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন।

গার্সিয়া বলে ওঠেন,—দেখবেন, কোনওভাবে আপনার এই সংখ্যাতত্ত্ব যেন মিডিয়ার কাছে লিক না করে। টাস্ক কমিটিকেও এভাবে ব্যাপারটা বলবেন না। বলুন উপজাতি আর পরিবেশ পরিবর্তনের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতেই এই টাস্ক কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে জনসংখ্যা পরিবর্তন ইত্যাদি নিয়েও অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

ডক্টর গেরার্ডো আর খানিকক্ষণের মধ্যেই বিদায় নিলেন। অ্যারন উঠতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে চোখের ইশারায় বসতে বলে গার্সিয়া বললেন,—অ্যারন, এই বুড়োর ওপর আমার বিশেষ ভরসা নেই, কী বলতে কী বলবে! তুমি এর প্রথম দিকের মিটিং গুলোতে থেকো। এটা ঠিক যে, উপজাতিদের সংখ্যা খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে। আমিও অন্য জায়গা থেকে এরকম খবর পেয়েছি। কিছু একটা অস্বাভাবিক হচ্ছে। তা না হলে হাজার-হাজার বছর ধরে যারা এসব জায়গাতে আছে, হঠাৎ করে আজ তারা অসুবিধেয় পড়বে কেন? এরা নিজে থেকে কোথাও চলে যাওয়ার লোকও নয়। এত বছরেও এদের অভ্যাসে একবিন্দু পরিবর্তন হয়নি। সামনে 24 জুন ইন্ডিয়ান ডে আসছে। এসময় মিডিয়া আবার এদের নিয়ে একটু বেশি মাতামাতি করে। আমি তার আগেই তোমার বিস্তারিত রিপোর্ট চাই।

সম্মতি জানিয়ে রিপোর্টটা হাতে তুলে নিয়ে অ্যারন বেরিয়ে এলেন মানবসম্পদ মন্ত্রী গার্সিয়ার চেম্বার থেকে।

॥ গ্যালওয়ে, আয়ার্ল্যান্ড, 1 মে ॥

কোরিব নদীর ধারে একটা পাব-এ বসে স্যান্ডুইচ খাচ্ছিলেন রবার্ট আর পল। রবার্ট ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আর পল 'ডাবলিন নিউজ'-এর সাংবাদিক। জানালার কাচের ওপর দিয়ে অঝোরে নেমে আসা বৃষ্টির ফোঁটার দিকে তাকিয়ে রবার্ট বলে উঠলেন,—ভাবলাম একটু গল্ফ খেলা যাবে। তা সকাল থেকে বৃষ্টি। ছাড়ার নাম নেই। আচ্ছা, গারদা পুলিশের যে লোকটা প্রথম ক্রপ সার্কেলটা দেখেছিল—কী যেন নাম তার?

—বিল। বিল অবশ্য প্রথম দেখেনি। ওর আগে এক স্থানীয় চাষি প্রথম দেখে। সে-ই বিলকে ডেকে জানায়। তা দেখে আপনার কী মনে হল? কারুর ইয়ার্কি? প্রচার পাওয়ার জন্য খেতে ওরকমভাবে নকশা করেছে?

—গত সাতবছরে এরকম চারবার দেখেছি। একবার ইংল্যান্ডে, একবার অস্ট্রেলিয়ায়, একবার ব্রাজিলে আর-একবার আমেরিকার টেক্সাসে। প্রত্যেকবার মনে হয়েছে মানুষ হয়তো এরকম করতেও পারে। তিরিশ-চল্লিশজন লোক মিলে রাতারাতি কি না পারে! কিন্তু এরকম করা সত্যিই শক্ত। তা তুমি কি ক্রপ সার্কেল আগে দেখেছ?

—না এর আগে দেখিনি। পড়েছি। বিজ্ঞানীরা নাকি প্লাজমা ভর্টেক্স থিয়োরি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাতাসে ধূলিকণাগুলো চার্জড হয়ে নাকি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। আর তার জন্য যে তড়িৎচৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়, তা-ই এই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে। আর এই ঘূর্ণিঝড় মাটির খুব কাছে হয় বলে, বৃত্তের মাঝের শস্যগুলো ওরকমভাবে শুয়ে পড়ে। গোল-গোল ক্রপ সার্কেল তৈরি হয়। বৃত্তের নানানরকমের নকশা।

রবার্ট উদাসীন ভাবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে ওঠেন,—এ-থিয়োরির প্রবক্তা কে জানো? ডক্টর গিল হার্ভে। 1960-তে বিভিন্ন মহাদেশ থেকে এরকম ক্রপ সার্কেলের খবর আসতে থাকে। বলা নেই-কওয়া নেই, হঠাৎ করে এক রাতের মধ্যে ফসল ভরতি মাঠের মধ্যে এরকম গোল-গোল নকশা। মাঝের শস্যগুলো নুয়ে মাটিতে পড়ে থাকে। এতই নিখুঁত সেসব নকশা যে প্রথমেই মনে হয় অন্য কোনও গ্রহের জীব এসে তৈরি করে দিয়ে যায়নি তো? ক্রপ সার্কেলের খবরে সারা পৃথিবী জুড়ে হইচই পড়ে যায়। এ-সময়ে আবার E.T. সিনেমাটাও বেরিয়েছিল। তাই লোকে প্রথমেই ভাবতে শুরু করল UFO ল্যান্ডিং-এর জন্যে এরকম হয়নি তো?

1990 সালের 7 জুলাই। আমি তখন ব্রিস্টলে। খবরের কাগজে দেখলাম ইংল্যান্ডের উইল্টশায়ারে রাতারাতি 149টা বৃত্ত দিয়ে ভারি সুন্দর একটা নকশা তৈরি হয়েছে। সে নকশাটার মধ্যে একটা অঙ্কের সংকেতও ছিল। এসবের মাঝে



গিল হার্ভে নিজেই হঠাৎ করে হারিয়ে গেলেন 1995 সালে। কোথায় গেলেন কে জানে!

পল কোকের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে উঠল,—তা আপনার কি এ-থিয়োরি নিয়ে প্রশ্ন আছে?

—এ-থিয়োরি প্রমাণিত কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, যখনই এরকম ক্রপ সার্কেল তৈরি হয়, আশেপাশে চৌম্বকক্ষেত্র প্রবল হতে দেখা গেছে। তবে বাতাসে প্লাজমা তৈরি হয়েছে বলেই যে এরকম ক্রপ সার্কেল তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু প্রমাণ করা যায়নি। কেউ-ই ক্রপ সার্কেল তৈরি হতে দেখেনি।

—তা কালকেও এরকম কিছু খবর এসেছে। সকালেও তো দেখলেন, এখানে এখনও চৌম্বক ক্ষেত্র স্বাভাবিকের থেকে শক্তিশালী। তা আপনি যেন কিছু একটা ভাবছেন?

—কিছু না, শুধু এবারে যে নকশাটা তৈরি হয়েছে তার মধ্যে কিছু একটা অস্বাভাবিক আছে। সেটাই ভাবার চেষ্টা করছি। আগে কি কখনও এই সংকেত দেখেছি? কে জানে! আর বড় রাস্তার একদম পাশে। লোকের চোখ এড়িয়ে তৈরি করা শক্ত। ভাবছি আরেকবার জায়গাটার এরিয়াল সার্ভে করে নিই। ওপর থেকে ভালো ছবি আসে। পুরো নকশাটা ভালো করে দেখা দরকার।

—চলুন, আমার তো বিবিসি-তে দেড়ঘণ্টা বাদে এর ওপর একটা প্রোগ্রাম আছে। তখন আকাশ থেকেই না হয় দেখানো যাবে। ওপর থেকে ভালো ছবি আসবে।

॥ কলকাতা, ভারত, 3 মে ॥

—লস্ট ওয়ার্ল্ড, জুরাসিক পার্ক যতবার দেখি ততবারই ভালো লাগে। এত ভালো সিনেমা, দেখতে শুরু করলে আর ওঠা যায় না। মিলন বলে ওঠে।

—কিন্তু পুরো প্লটটাই তো গাঁজাখুরি। কোনওদিন ওরকম সম্ভব? 65 মিলিয়ন বছর আগে যারা উধাও হয়ে গেছে, ফসিল থেকে সেই ডাইনোসরদের তৈরি করা সম্ভব! অবাস্তব কিছুই প্রতীকের পছন্দ নয়।

আজকে আমাদের শনিবারের আসরে প্রায় সবাই উপস্থিত। বিশ্বজিৎদা, অনিলিখাও হাজির। আসলে বাইরে যা গরম পড়েছে তাতে শনিবারেও আর কেউ বাড়ির বাইরে দূরে যাচ্ছে না। সন্ধে হতেই এক-এক করে প্রায় সবাই হাজির আমাদের শনিবারের আড্ডায়। টিভিতে লস্ট ওয়ার্ল্ড দেখাচ্ছিল, শেষ হওয়ার সঙ্গে -সঙ্গেই তা-ই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে।

—আচ্ছা অনিলিখাদি, তোমার কী মনে হয়? ডাইনোসর কি আর ফিরে পাওয়া সম্ভব? শিশির জিগ্যেস করে।

—কেন ডাইনোসর ফিরে এলে কি খুব খুশি হতিস? অবশ্য দু-একজনকে মেরে ফেললে তোরা যে খুব আনন্দিত হতিস তা নিয়ে আমারও কোনও সন্দেহ নেই। অনিলিখা মুচকি হেসে বিশ্বজিৎদার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে নিয়ে আবার বলে,—কল্পনাটা কিন্তু একেবারে আজগুবি নয়। ডাইনোসর অবশ্য ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়, তবে সাম্প্রতিককালে যেসব প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে যেমন তাসমানিয়ার বাঘ—তাদেরকে হয়তো ক্লোন করে ফিরে পাওয়া সম্ভব।

—কীভাবে?

—জুরাসিক পার্কে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবেই বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে ডাইনোসরের ডিএনএ-এর পুরো অংশ এত লক্ষ বছর পরে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া, ডিএনএ পাওয়া গেলেও ভ্রূণ থেকে বাচ্চা তৈরি করার জন্য ওই ধরনের কোনও প্রাণীর গর্ভ ব্যবহার করতে হবে। তার মধ্যেই তো বড় হবে। হাতির বাচ্চা তো আর ছাগলের পেটে হবে না। কিন্তু ডাইনোসর শ্রেণির কোনও প্রাণীই তো আজ আর নেই।

—তা, তুমি বলছ ফসিল থেকে ডিএনএ বের করে ওইরকম বিলুপ্ত প্রাণী ফিরে পাওয়া সম্ভব? প্রতীকের মনে এখনও প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, সেরকম চেষ্টা তো অলরেডি চলছে। মেরু অঞ্চলের বরফের তলায় হাড়, দাঁত, নখ, চুলের কোষ হাজার-হাজার বছর ধরে বরফে জমাট অবস্থায় অবিকৃত থাকতে পারে। প্রথমেই ওসব কোষ থেকে ডিএনএ বের করে আনতে হবে। ডিএনএ-র মধ্যেই ওই বিলুপ্ত প্রাণীর সব কিছু ধরা থাকে। তবে পুরো ডিএনএ এত বছর পরে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়ার আশাটা একটু বাড়াবাড়ি। ধরা যাক, ম্যামথের একটা কোষ পাওয়া গেল। এবার, ম্যামথের কাছাকাছি প্রাণী কোনটা? হাতি। ম্যামথের ভাঙাচোরা ডিএনএ-র বাকি অংশ হাতির ডিএনএ দিয়ে সম্পূর্ণ করা সম্ভব।

—মোদ্দাকথা হল বক আর কচ্ছপ মিলিয়ে বকচ্ছপ তৈরি করলে, তাই তো? সাগ্নিক অনিলিখার কথা সরল করার চেষ্টা করে।

—না, তা কিন্তু নয়। আমরা শুধু ম্যামথের ডিএনএ মেরামত করে নিলাম। হাতির থেকে সেটুকুই নিলাম যা ম্যামথের ডিএনএ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল।

—তা ম্যামথের ডিএনএ না হয় পেলে, তারপরে?

—এবার যেভাবে ক্লোনিং করা হয় ঠিক সেভাবে হাতির ডিম্বাণু বের করে তার থেকে নিউক্লিয়াস বাদ দিয়ে ওই জায়গায় ম্যামথের মেরামত করা ডিএনএ ঢুকিয়ে দিতে হবে। তারপর ইলেকট্রিক শকের সাহায্যে কোষবিভাজন শুরু করতে

হবে। এভাবে যে ভ্রূণ তৈরি হবে তা এবার হাতির গর্ভে রাখতে হবে। ব্যস, হাতির যে বাচ্চা হবে, তা আসলে হবে ম্যামথ।

বিশ্বজিৎদা না শোনার ভান করে দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর গুণগুণ করছিল। থামিয়ে পাশ থেকে মন্তব্য করল,—হ্যাঁ, অনিলিখার বাড়িতে বসে বিজ্ঞানীরা গোপনে এসব রিসার্চ করছেন। আমাদের পাড়ার নেড়িকুকুর ভুলোর যে বাচ্চাটা হয়েছে, তার হাবভাব তাই ঠিক তাসমানিয়ার বিলুপ্ত বাঘের মতো। অনিলিখাকে দেখলেই তাড়া করে।

অনিলিখা বিদ্রূপ গায়ে না মাখিয়ে বলে উঠল,—বিজ্ঞানীরা সাইবেরিয়ায় এরকম এক প্লিটোসিন পার্ক তৈরি করার চেষ্টা করছেন, যেখানে প্লিটোসিন যুগের হারিয়ে যাওয়া প্রাণীদের দেখতে পাওয়া যাবে। অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্ ইউনিভার্সিটিতে ঠিক এভাবেই তাসমানিয়ার বিলুপ্ত বাঘ ক্লোন করার চেষ্টা চলছে। সবকিছু ঠিকঠাক হলে বছরপনেরোর মধ্যেই এই বিলুপ্ত বাঘকে ফিরে পাওয়া যেতে পারে।

—কিন্তু অনিলিখাদি, এ তো আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাচ্ছি। যেসব প্রাণী জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার উপযুক্ত নয়, তাদেরকে আবার ফিরিয়ে আনছি। আর—। বাপ্পার কথায় বাধা এল। অনিলিখার সেল ফোনটা বাজছে।

—হ্যালো, অনিলিখা স্পিকিং।

একটা কানে হাত রেখে অনিলিখার শোনার চেষ্টা দেখে মনে হল খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। পুরো কথাবার্তাই ইংরেজিতে হল। মিনিটপাঁচেক ফোনে অনিলিখা যে কথা বলল তার বাংলা তর্জমা করলে এরকম দাঁড়ায়,

—গ্যারি, বহুদিন পরে, তা কী খবর!...না আমি খবরটা দেখিনি। বিবিসি-তে! হ্যাঁ, এখানে ও চ্যানেলটা আসে। দেখে নেব।...ক্রপ সার্কেল!...তুমি ওই একই সংকেত...আশ্চর্য!...তা এটা কত পুরোনো?...পঞ্চাশ হাজার বছর!...দ্যাখো যতটা জটিল ভাবছ ততটা কিন্তু নয়। হতেই পারে কেউ ওই সংকেতটা দেখে এরকম তৈরি করেছে।...না, তাহলে সত্যিই ভাবার মতো।...হ্যাঁ তোমার নাম্বার তো ফোনেই থাকবে। আমি পরে ফোন করব।

ফোনটা ছেড়েই অনিলিখা বিল্টুকে বলল,—বিবিসি-টা চালা তো!

—কী ব্যাপার, কিছু অসুবিধে হয়েছে?

—আগে চালা, পরে বুঝিয়ে বলছি।

বিবিসি চালানো হল।

সাংবাদিক পল নিউম্যান। একটা ছোট হেলিকপ্টার থেকে নীচের জমি দেখানো হচ্ছে। মাইলখানেক জায়গা জুড়ে ভুট্টার জমিতে ছোট-বড় বৃত্তের রকমারি



নকশা। মনে হয়, যেন নিপুণ হাতে মাসের-পর-মাস পরিশ্রম করে কেউ এই নকশা তৈরি করেছে। বৃত্তের মাঝের শস্যগুলো শুয়ে পড়েছে। যেন খুব ভারী কিছু দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে। পল নিউম্যান বলে চলেছেন,—এত বড় ক্রপ সার্কেল এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। মাত্র এক রাতের মধ্যে এই নকশা তৈরি হয়েছে আয়ার্ল্যান্ডের পশ্চিমে গ্যালওয়ে কাউন্টিতে। আমার সঙ্গে আছে বিখ্যাত জৈব পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট ওয়াইল্ড। রবার্ট আপনার কী মনে হয়?

রবার্ট বলতে শুরু করে,—ক্রপ সার্কেল তৈরি হয় যখন বাতাসের ধূলিকণা চার্জড হয়ে প্লাজমা সৃষ্টি করে। এই প্লাজমা যে তড়িৎচৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে তার জন্য...

অনুষ্ঠানটা মিনিটপনেরো হল। অনিলিখাকে দুবার 'আশ্চর্য' বলতে শুনলাম। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে অনিলিখা খুব সংক্ষেপে বলল,—আমার বন্ধু গ্যারির ফোন, আমেরিকার কলোরাডো থেকে। ঠিক এই একই সংকেত ও এক সদ্য আবিষ্কৃত গুহায় দেখেছে। ব্যাপারটা সত্যিই ভাবার মতো। একটা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি সংকেত আরেকটার সঙ্গে কখনও এক হতে পারে না।

॥ ডেনভার, কলোরাডো, আমেরিকা ৪ মে ॥

ডেনভার এয়ারপোর্টের 4 নং টার্মিনালের লাগেজ নেওয়ার জায়গায় অপেক্ষা করছিল গ্যারি। প্রায় আট বছর বাদে দেখা, তাও দূর থেকেই চিনতে পেরেছিল অনিলিখা। একটু যেন রোগা হয়ে গেছে। শৌখিন দাড়িটুকু বাদ দিলে আর অন্য কোনও পরিবর্তন নেই।

—কী, আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

—নাহ্, শুধু তো লন্ডনে একবার প্লেন চেঞ্জ।

—তুমি যে এ ক'দিনের মধ্যে আসতে পারবে, প্রথমে বিশ্বাস-ই হয়নি।

—আসলে আমার ভিসা তো ছিলই। সেদিন ফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলার পর আর গ্যালওয়ের ওই ক্রপ সার্কেলের ছবিটা দেখার পর কৌতূহল আর সামলাতে পারিনি। তা, তুমি বলছ ওই একই নকশা দেখেছ ম্যানিটো স্প্রিং-এর গুহায়।

—হ্যাঁ, কাল নিজের চোখেই দেখবে। আমি আয়ার্ল্যান্ডের ক্রপ সার্কেলের নকশাটার একটা বড় ছবি তৈরি করে রেখেছি। মিলিয়ে দেখে নেবে। তবে খেয়াল রেখো আমি তোমাকে ছাড়া এখন পর্যন্ত কাউকে বলিনি।

—তা হঠাৎ করে আমার কথাই মনে পড়ল?

—দেখ সবাই না জানলেও আমি তোমার ন্যাচারাল এবিলিটির কথা জানি। আমার এখনও মনে আছে যে-কোনও সাংকেতিক ধাঁধা তুমি কীভাবে চটপট সল্‌ভ করে দিতে পারতে। এ সংকেতের অর্থ কেউ না বুঝলেও তুমি ঠিক বুঝবে।

এয়ারপোর্ট থেকে ম্যানিটো স্প্রিং-এর হোটেলের উদ্দেশ্যে ট্যাক্সি নিল দুজন। সবে বসন্ত শুরু হয়েছে। গাছে নতুন ফুল ধরেছে। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় দূরে রকি মাউন্টেন দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় এখনও সাদা বরফ। পাশে ঘাসের ওপর মাঝেমধ্যে রোদের চোখ এড়ানো বরফ।

—আমি আরও উত্তেজিত কারণ, সবার জন্য খোলা গুহা আমি দেখেছি, কিন্তু এভাবে সদ্য আবিষ্কৃত গুহা যা সাধারণের জন্য এখনও খোলেনি, তা আগে কখনও দেখিনি। তা গুহাটা দেখতে পেলে কীভাবে?

—ম্যানিটো স্প্রিং-এর কাছে ইন্টারস্টেট হাইওয়েতে কাজ হচ্ছিল। এই রাস্তাটার দু-ধারে রকি মাউন্টেন। রাস্তা করার জন্য কনস্ট্রাকশান ইঞ্জিনিয়াররা পাহাড়ের একটা অংশে পরপর কয়েকটা গর্ত করে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ করে একটা জায়গা এভাবে বোমা দিয়ে ওড়াতে গিয়ে দেখা গেল উড়ে যাওয়া পাথরের পরিমাণ নিতান্তই কম। কারণ খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেল এই গুহা যা ওই রাস্তার অংশে এসে গিয়েছিল। তা এটা দেড়মাস আগের ঘটনা।

প্রথমেই ডাক পড়ল আমার। গুহার ম্যাপ তৈরি করতে। যে-কোনও গুহা আবিষ্কার করার পর প্রথমেই সে গুহার ম্যাপ তৈরি করতে হয়। তারপরে আসে জীবাশ্মবিদ, যারা দেখে ওই গুহাতে কী-কী প্রাণীর ফসিল আছে, গুহা কত পুরোনো। তারপর আসে হাইড্রোলোজিস্টরা। তারা দেখে গুহার মধ্যে জল কীভাবে ঢুকত, এখন জল কীরকমভাবে আসছে, কীভাবে ভবিষ্যতে জল ঢুকবে-বেরোবে। ভূতত্ত্ববিদরা দেখতে আসে কীভাবে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে ওই গুহা তৈরি হয়েছে। কিন্তু সবার আগে গুহার ম্যাপ তৈরি করতে হয়। তা না হলে লোকে ঢুকবে, কিন্তু আর বেরোতে পারবে না।

—তা তোমার কাজটা তো খুব ভয়ের! এমন একটা জায়গায় যেতে হয় যেখানে লক্ষ-লক্ষ বছর মানুষের পা পড়েনি। তাও আবার নিকষ কালো অন্ধকারে।

—এবার সেজন্যই তোমাকে সঙ্গে নিচ্ছি। গ্যারি মুচকি হেসে বলে।

—তা তোমার এখনও গুহার ম্যাপ তৈরি করা হয়নি?

—না, আমরা তো সব মিলিয়ে বড়জোর সাত-আট ঘণ্টা কাটিয়েছি গুহায়। গুহার ম্যাপ তৈরি অন্তত তিন-চার মাসের কাজ। তার জন্য প্রস্তুতিও লাগে। আমরা গুহার মুখ বন্ধ করে চলে এসেছিলাম যাতে কেউ ঢুকতে না পারে। কাল আবার কাজ শুরু হবে।

—ওই নকশাগুলো দেখলে কখন?

—আমি হেঁটে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে বেশ খানিকটা ভেতর অবধি গিয়েছিলাম। তা প্রায় একমাইল হবে। আমার মাথার হেলমেটে জোরালো আলো ছিল। তাতেই দেখলাম ওই নকশাগুলো। দেওয়ালের গায়ে খোদাই করা। ওইরকম নকশা শুধু এক জায়গায় নয়, অন্তত তিন-চারটে জায়গায় দেখেছি।

—তুমি নিশ্চিত, তা একইরকম? আর কেউ সঙ্গে ছিল?

—না, আর কেউ ছিল না। যারা আমার মতো ম্যাপ তৈরি করে, তাদের মেমারি খুব ভালো হতে হয়। গ্যালওয়ের ওই ক্রপ সার্কেল যে ওই নকশাগুলোরই বড় সংস্করণ তা আমি হলফ করে বলতে পারি। তবে হ্যাঁ, সামান্য এদিক-ওদিক হতেই পারে। আর তাই তো আমার এত অবাক লাগল। আমি ছাড়া গুহার ওই নকশার কথা কারুর জানার কথা নয়।

—গ্যারি, ভুলে যেও না আমরা অনেক সময় খুব সহজ কথা ভুলে যাই। তোমরা নিশ্চয়ই এমন জায়গা দিয়ে ঢুকেছ যা গুহার প্রবেশপথ নয়। না হওয়ারই কথা। তোমাদের কাছে গুহার আবিষ্কার তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট, হয়তো ওর অন্য কোনও প্রবেশপথ আছে, যা দিয়ে কেউ এসে ওই নকশাটা দেখেছে। নকশা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠানো কিছুই শক্ত নয়। আরেকটা কারণও হতে পারে। এই নকশা হয়তো আরও কোথাও আছে, যা আমাদের জানা নেই। গ্যালওয়ের ক্রপ সার্কেল যে তৈরি করেছে সে হয়তো ওই নকশা দেখেই করেছে।

কথা বলতে-বলতে থেমে গেল অনিলিখা। উলটো দিকের লেনে একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। একটা বিশাল ট্রাক কাত হয়ে পড়ে আছে। কথা আর না বলাই ভালো। ড্রাইভার না অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

॥ ম্যানিটো স্প্রিং, কলোরাডো, আমেরিকা 10 মে ॥

—কী পারবে তো ঢুকতে? সামনে গুহাটা খুব সরু হয়ে গিয়েছে, তার দিকে নির্দেশ করেই বলে ওঠে গ্যারি।

—তা, তুমি তো বলছিলে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। সামনে যা অবস্থা, তাতে তো মনে হচ্ছে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে-শুয়ে যেতে হবে।

—বেশি দূর নয়। একশো ফুট যাওয়ার পরে দেখবে আবার আস্তে-আস্তে চওড়া হয়ে গেছে।

—ওপথে কোনও সাপ-খোপ, জন্তু—নেই তো?

—বলা শক্ত সামনে কি আছে। এরকম বন্ধগুহায় কোনও জন্তু থাকার চান্স কম। তবে, র‍্যাটল স্নেক বা র‍্যাকুন থাকাটা অস্বাভাবিকও নয়, যদি এর অন্য কোনও পথ থেকে থাকে।

—আচ্ছা ওই যে গুহার ছাদ থেকে বড়-বড় স্তম্ভের মতো জিনিসগুলো ঝুলছে, কি যেন বলে ওগুলোকে?

—স্ট্যালাকটাইট্স। এসব গুহা সাধারণত ক্যালসাইট দিয়ে তৈরি হয়। গুহার উপরের দেওয়াল থেকে জল ঢোকে আর সে জল গুহার ক্যালসাইট নিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা করে পড়ে। পরে জল বাষ্প হয়ে যায়। ক্যালসাইট ওপরের সিলিং থেকে ঝুলে থাকে। বাড়তে-বাড়তে লক্ষ-লক্ষ বছরে এরকম তৈরি হয়। গুহার শোভা বাড়ায়। তা এখানে এত যখন রয়েছে, তার মানে কোনও জন্তুর আসা-যাওয়া নিশ্চয়ই নেই। তাহলে এগুলো ভেঙে যেত।

খানিকটা দ্বিধা নিয়ে অনিলিখা গুহার সরু মুখটার দিকে এগিয়ে যায়। গ্যারি আগে, পেছনে অনিলিখা। বুকে ভর দিয়ে শুয়ে হাত দিয়ে ঠেলে-ঠেলে এগোতে থাকে। হেলমেটের আলোয় চারদিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

প্রায় একশো ফুট হামাগুড়ি দেওয়ার পর ওরা একটা বড় গুহার গহ্বরে প্রবেশ করল। বেরোনোর পরেই যে চাতালটা তাতে অনেক ছোট-ছোট সরু হাড় পড়ে আছে। খুব সাবধানে গ্যারি একটা হাড় হাতে তুলে নিয়ে বলল,—এটা সাপের হাড়ের ফসিল। দশ-বারো হাজার বছর পুরোনো হবে। এই চাতালটায় বড় কোনও প্রাণী থাকত মনে হয়। আচ্ছা, ওপরে ওটা কী! মাটি থেকে চোদ্দো-পনেরো ফুট ওপরে একটা থাবার দাগ, কোন প্রাণী এত বড় হতে পারে?

—বড় ভালুক হবে। দশ-বারো হাজার বছর আগে এসব জায়গায় এক ধরনের ছোট মুখের বিশাল চেহারার ভালুক ছিল। যারা লম্বায় পনেরো-ষোলো ফুট হত। দাঁড়ালে ওরা ওই উচ্চতায় অনায়াসে নাগাল পাবে। প্রচণ্ড হিংস্র এসব ভালুকের প্রিয় জায়গা ছিল এরকম গুহা। তবে এরা প্রায় দশ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

—তার মানে এ গুহার বয়স অন্তত দশ হাজার বছর। চলো, আরেকটু এগোলেই ওই নকশাগুলোর জায়গায় পৌঁছে যাব।

গ্যারি গুহার মধ্যে দিয়ে এগোতে লাগল। পায়ের তলা দিয়ে একটা মৃদু জলস্রোত বয়ে যাচ্ছে। প্রায় আধমাইল যাওয়ার পর এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল,—ওই দ্যাখো।

হেলমেটের আলোয় আলোকিত দেওয়াল দেখে অনিলিখার মুখ থেকে শুধু একটাই শব্দ বেরিয়ে এল,—আশ্চর্য!

পকেট থেকে গ্যালওয়ের ক্রপ সার্কেলের নকশাটার ছবি বের করে নিল

গ্যারি। ডানদিকের দেওয়ালে হুবহু সে-ই নকশা। কেউ যেন খুব যত্ন করে নিখুঁতভাবে তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে বাহাত্তরটা বৃত্ত আছে। ওপরের দিক থেকে ওরা মেলাতে শুরু করল। বৃত্তগুলো ওপর থেকে নীচের দিকে ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে। তারপর আবার বড় হয়েছে। বৃত্তগুলোর পারস্পরিক বিন্যাস দুটো ছবিতেই হুবহু এক। কিছু-কিছু বৃত্তের মধ্যে গ্যাপ খুবই কম। কয়েকটা ক্ষেত্রে বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করেছে। জটিল নকশা। হঠাৎ করে এই দুটো নকশা কখনওই মিলতে পারে না।

একটা কার্ডের সাইজের ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে গ্যারি পরপর ছবি তুলতে লাগল। অনিলিখা খুঁটিয়ে দুটো নকশা মিলিয়ে দেখতে লাগল। বৃত্তগুলোর ব্যাসার্ধ, বিভিন্ন বৃত্তের কেন্দ্রের কৌণিক অবস্থান, কী হারে দুটো বৃত্তের মধ্যে দূরত্ব কমেছে—এসব মাপতে লাগল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে নিস্তব্ধতা ভেঙে অনিলিখা বলে উঠল,—গুহার বয়স কত তা আমাদের জানতে হবে।

—গুহায় পাওয়া ফসিল দেখলেই গুহার বয়স বোঝা যাবে।

—পঞ্চাশ হাজার বছর অবদি ফসিল থেকে বোঝা যাবে। তার বেশি পুরোনো হলে অন্য উপায়। তার থেকে পুরোনো কোন ফসিলে আর রেডিও কার্বন থাকবে না। রেডিও কার্বন ডেটিংও কাজ দেবে না।

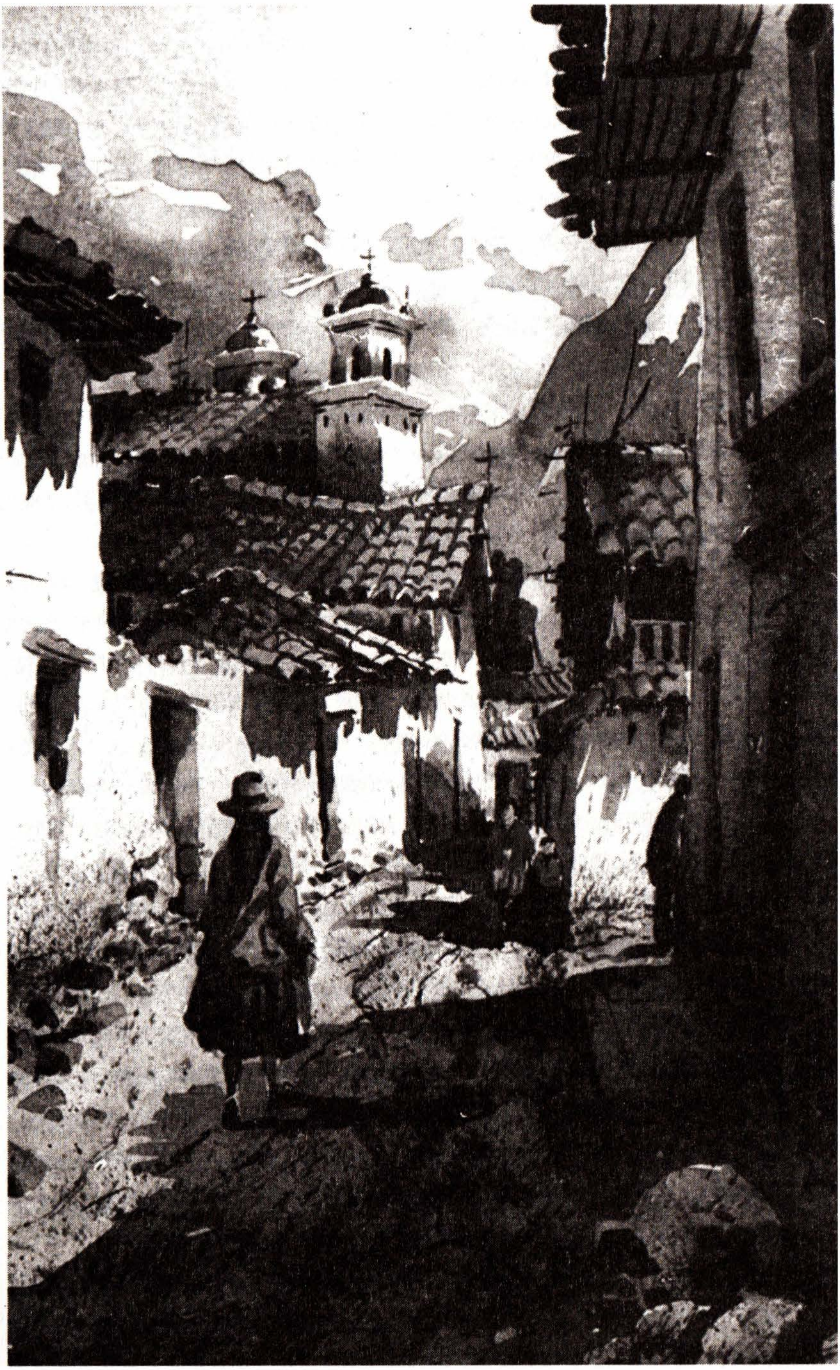
—তা সেক্ষেত্রে উপায়?

—এখানকার দেওয়ালে শেষ কবে সূর্যের আলো পড়েছিল তা টেস্ট করলেই বেরিয়ে পড়বে। একে বলে কসমোজেনিক ডেটিং। এতে পঞ্চাশ লক্ষ বছর অবদি ঠিকঠাক বোঝা যায়। আমাদের ঠিক সে উপায়ে দেখে নিতে হবে এ নকশা কত পুরোনো!

—হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে ভূ-তত্ত্ববিদ ক্রিস স্টিভেন্স আছেন। গুহায় ঢোকার সময় যাঁর সঙ্গে দেখা হল। উনি এ ব্যাপারে বলতে পারবেন। তবে কিছুদিন সময় লাগবে। তুমি কি এখনই এই নকশার কথা সবাইকে জানাতে চাও? ব্যাপারটা নিয়ে খুব হইচই পড়ে যাবে।

—হ্যাঁ, সে তো পড়বেই। কারণ এ ঘটনা এটাই প্রমাণ করবে যে গ্যালওয়ের ক্রপ সার্কেল প্রাকৃতিক ভাবে প্লাজমা ভর্টেক্সের জন্য তৈরি হয়নি। তাহলে এরকম একটা নকশার সঙ্গে হুবহু মিলে যেত না। এটাও প্রমাণ করবে যে, এই ক্রপ সার্কেল মানুষের হাতে তৈরি নয়। কারণ এই নকশা গত দশ হাজার বছরে কেউ দেখেনি। এত জটিল দুটো নকশার মধ্যে এতটা মিলও অস্বাভাবিক।

অর্থাৎ পড়ে রইল 'অ্যালিয়েন' থিয়োরি। অন্য গ্রহ থেকে কোনও জীব



এসেছিল এই গ্রহে। তারাই তাদের সংকেত রেখে গিয়েছিল এ-গুহায় বেশ কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ বছর আগে। তারপর থেকে তারা হয়তো আরও কয়েকবার এসেছে। প্রত্যেকবার তারা কোনও কারণে এসব নকশা এঁকে রেখে গেছে। হয়তো, এর মধ্যে এমন কোনও সংকেত আছে যা উদ্ধার করতে পারলে আমরা এদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারব।

গ্যারি বলে ওঠে,—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। তবে ও নিয়ে আলোচনা পরে হবে। আরও খানিকটা এগোলে এরকম নকশা আরও দেখতে পাবে। প্রায় একইরকম। চলো ওদিকে যাওয়া যাক। আমার মনে হয় এই নকশার কথাটা এখনই কাউকে না জানানোই ভালো।

অনিলিখা মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

পায়ের নীচ দিয়ে যে জলধারা বয়ে যাচ্ছে তার গভীরতা একটু বেড়েছে। অনিলিখা বলে ওঠে,—তা এ-গুহার কি অন্য কোনও মুখ আছে বলে মনে হয়, যা দিয়ে কেউ এখানে এসে থাকতে পারে?

—তুমি কি এই জলস্রোত দেখে ভাবছ? অনেক গুহাতেই এরকম জলধারা থাকে যা নদীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। আমার ধারণা এ-গুহায় এমন কোনও প্রবেশ পথ নেই, যা দিয়ে কোনও প্রাণী প্রবেশ করতে পারে। না হলে আমরা বাদুড়, সাপ, কেঁচো এসব দেখতে পেতাম। গুহার কোন প্রবেশপথ থাকলে বাদুড়রা তো থাকবেই। অনেক গুহাতে হাজার-হাজার বাদুড় থাকে। বাদুড়ের মল, মরা বাদুড়ে মাটি নোংরা হয়ে থাকে। এই যে এতটা এলাম দেখলে সেরকম কিছু?

—সাদা কাঁকড়া, গ্যারি। ওই দেখো সামনে জলের মধ্যে। বলতে না বলতে প্রমাণ পেয়ে গেলে তো!

গ্যারি ঝুঁকে নীচু হয়ে দেখতে থাকে। একটা নয়, দুটো সাদা কাঁকড়া। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিয়ে বলে উঠে,—এরা চোখে দেখতে পায় না। গুহার সবচেয়ে অন্ধকার জায়গায় এরা থাকে। এরকম বেশিরভাগ জীবের চোখ থাকে না, থাকলেও দেখতে পায় না। এ এক অদ্ভুত জীবজগৎ। আমরা কিছুই জানি না এদের সম্বন্ধে। তবে এরা কিন্তু গুহার প্রবেশপথ আছে প্রমাণ করে না। এরা সারাজীবন গুহার গভীর অন্ধকারেই কাটায়। জন্মায় ও এখানে, মরেও এখানে। কিন্তু বাদুড়, সাপ, র‍্যাকুন, ওয়েলবার্ড এরা গুহার মধ্যে আসা-যাওয়া করে। এদের কাউকে দেখলে বুঝতাম গুহার অন্য কোন পথ আছে। তবে এটাও হতে পারে যে গুহার অন্য অংশে ওরকম কোনও জীব আছে, এখানে নেই।

খানিকবাদে ওরা গুহার আরেকটা বড় চেম্বারে এসে পৌঁছল। স্ট্যালাগ্‌মাইট আর স্ট্যালাক্‌সাইটে ভরা প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা, তিরিশ ফুট চওড়া বিশাল ঘর। দেওয়ালে ক্যালসাইট দিয়ে তৈরি ভারি সুন্দর জিপসাম ফ্লাওয়ার। তার পাশেই

আগেরটার থেকে প্রায় দেড় গুণ বড় আরেকটা নকশা।

ওরা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে থাকে। এটা হুবহু আগেরটার মতো মনে হলেও ঠিক তা নয়। আগেরটাতে প্রতি পাঁচটা বৃত্ত পরপর ছোট হয়ে আসার পর আবার বড় হতে শুরু করছিল। এটাতে সেটা দুটো বৃত্তের পর। বৃত্তের কেন্দ্রগুলোর পারস্পরিক কৌণিক অবস্থানও আলাদা।

—কী বুঝছ অনিলিখা?

—যে-ই করে থাকুক, সে তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখে। এটা অত্যন্ত প্ল্যান করে তৈরি করা সংকেত। এটা আমাদের 'সেটি' ইনস্টিটিউটে জানানো দরকার। ওদের কাজই হল অন্য গ্রহের থেকে পাঠানো সংকেত উদ্ধার করা। যদি এটা গ্রহান্তরের কারওর কাজ হয়ে থাকে, তাহলে ওরা এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। তবে একইসঙ্গে আমাদের জানতে হবে কত হাজার বছর আগে শেষ এই গুহায় কোন প্রাণীর আনাগোনা...

আহ্! গ্যারির আর্তনাদে অনিলিখার কথা মাঝখানেই বন্ধ হয়ে গেল। গ্যারি ডান হাত চেপে মাটিতে বসে পড়েছে।

অনিলিখা ঘাবড়ে গেলেও মুহূর্তে সামলে নেয়। গ্যারির কাছে ছুটে আসে। এটুকু সময়ের মধ্যেই গ্যারির ডান হাতটা নীলচে হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে গ্যারি বলে,—ওই, ওই পোকাটা।

আরশোলার মতো দেখতে পোকাটা দু-ইঞ্চির মতো লম্বা। অজস্র লোমশ পা। গুহার চাতাল ধরে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। অনিলিখা জুতো দিয়ে চেপে মারার জন্য তাড়া করেছিল। গ্যারি যন্ত্রণার মধ্যেও বারণ করল,—মেরো না অনিলিখা। এ কোনও অজানা জীব। পারলে আমার ক্যামেরাটা দিয়ে ছবি তুলে নাও। এরকম প্রাণী হয়তো সারা বিশ্বে আর কোথাও পাবে না।

অনিলিখা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে গিয়ে খানিক দূরে এসে থমকে দাঁড়াল। পোকাটা ওর দ্বিগুণ আকারের আরেকটা পোকার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তার ওপর উঠে পিঠের মধ্যে দিয়ে শরীরের মধ্যে ঢুকে গেল। ছবি তোলার আগেই বড় পোকাটা পাথরের মধ্যে হারিয়ে গেল। এ যেন এক অপার্থিব জীব। অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখার পর ছুটে গ্যারির পাশে এসে দাঁড়াল অনিলিখা।

—তোমার শরীর আরও খারাপ হওয়ার আগে আমাদের এই গুহা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে গ্যারি। এ গুহাতে এরকম ডেঞ্জারাস পোকা আরও আছে।

—আমার ব্যাগে একটা ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশান আছে। আমার ডান হাতের ওপরদিকে ইঞ্জেকশানটা দিয়ে দিতে পারবে? অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। যন্ত্রণাটা যেন খুব তাড়াতাড়ি সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

অনিলিখা তাড়াতাড়ি ইঞ্জেকশানটা দিয়ে দিল। এ ব্যাপারে ওর অভিজ্ঞতা

আছে। তারপর ওয়াকিটকিতে সাহায্য চেয়ে পাঠাল। অবিলম্বে যাতে ডাক্তার পাঠানো হয়। ওরা জানাল, ডাক্তার সুনীল নারাং ও তাঁর টিম আসছে। কিন্তু সাহায্য আসতে আধঘণ্টা লেগে যাবে। গ্যারির হাত ধরে ফেরার পথে এগোতে থাকে অনিলিখা। মিনিট পনেরো বাদে গ্যারি একটা পাথরের উপর বসে পড়ল।

—আমি বোধহয় আর বাঁচব না। আমার নিশ্বাস নিতে অস্বাভাবিক কষ্ট হচ্ছে। ওই পোকাগুলো ওই নকশার গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্বে ছিল। আমরা দেখে ফেলেছি। আমাদের ওরা বাঁচতে দেবে না। প্রলাপ বকতে থাকে গ্যারি।

—আবোলতাবোল কথা বোলো না গ্যারি। তোমার কিছু হবে না। ডাক্তার এলেই চিকিৎসা শুরু হয়ে যাবে।

গ্যারি আস্তে-আস্তে পাথরটার ওপর শুয়ে পড়ল। কথা আস্তে-আস্তে জড়িয়ে আসছে। গুহার আলো হঠাৎ বেড়ে গেল। ডাক্তার সুনীল নারাং আর দুজন লোক খুব দ্রুত এদিকে এগিয়ে আসছে।

ডাক্তারদের দলের সামনেই গ্যারি মারা গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে। কী বিষ এত দ্রুত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে তা কারও জানা নেই। গ্যারির ব্রেনকেও অ্যাটাক করেছে।

গ্যারির ডেডবডি দ্রুত গুহার বাইরে বের করে আনা হল। এত দ্রুত জলজ্যান্ত একটা লোক মারা গেল, তা মানতে পারছিল না অনিলিখা। গ্যারির জন্যই এখানে আসা। বহু বছর ধরে গ্যারির সঙ্গে আলাপ। শক্ কাটিয়ে উঠতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। এতক্ষণে ফোনটার কথা খেয়াল হল। গুহার মধ্যে সেলফোন কাজ করে না। দুটো মিসড কল অ্যালার্ট, আর-একটা মেসেজ। পেরু থেকে রিকার্ডো ফোন করেছে। অবিলম্বে রিকার্ডোকে ফোন করতে বলেছে।

রিকার্ডো আর অনিলিখা হার্ভাডে সহপাঠী ছিল। কিন্তু এখন আর ফোন করার মানসিকতা নেই অনিলিখার। পরে ফোন করা যাবে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা পুলিশের গাড়িও এসে গেছে। অনুমতি পেয়ে অনিলিখা হোটেলের উদ্দেশ্যে গাড়ি ধরল। নকশার ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই পুলিশের কাছে আর উল্লেখ করল না অনিলিখা। ঠিক সময়ে ঠিক লোকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা উচিত।

॥ লিমা, পেরু 15 মে ॥

'জর্জ শ্যাভেজ' ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল অনিলিখা। রিকার্ডোকে এয়ারপোর্টে আসতে বারণ করেছিল। শুধু-শুধু ঝামেলা

বাড়ানো। লিমাতে ছোটখাটো চুরি-ছিনতাই হলেও এমনিতে শহরটা নিরাপদ। ট্যাক্সি পেতে সময় লাগল না। ট্যাক্সিতে উঠে অনিলিখা হোটেলের ঠিকানাটা বলল।

'কানট্রি ক্লাব, লিমা হোটেল, লস উইক্যালিপটোস 590।' লিমার নামকরা হোটেল। এত সংক্ষিপ্ত ঠিকানা দেখে অনিলিখা প্রথমে অবাক হয়েছিল। পরে জেনেছে পেরুতে সব জায়গায় ঠিকানা এরকমই হয়। সংক্ষিপ্ত রাস্তার নাম আর বাড়ির নম্বর। যেমন 'পিজ্যারো 135।' 135-এর 1 রাস্তার উপর কোন ব্লকে বাড়িটা তা বোঝায়।

ট্যাক্সিতে যেতে-যেতে চারদিক দেখে বেশ হতাশ হতে হল অনিলিখাকে। কলকাতার মতোই ট্রাফিক জ্যাম। রাস্তার ধারে ডাঁই করা আবর্জনা। দামি গাড়িও যেমন আছে, তেমনি আছে রাস্তার ধারে গিটার বাজিয়ে গান করা ভিখারির দল।

1535 সালে ফ্রানসিসকো পিজ্যারো, লিমাতে দক্ষিণ আমেরিকার স্প্যানিশ কলোনির রাজধানী স্থাপন করেন। লিমা ছিল রাজধানী হওয়ার আদর্শ জায়গা। স্বাভাবিক বন্দর। ইনকাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সোনাদানা লিমা-মারফত স্পেনে চালান হয়ে যেত। এভাবে তিনশো বছর ধরে লিমা ছিল স্পেনের দক্ষিণ আমেরিকা-সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড। 'লিমা'-র স্প্যানিশ পরিভাষা হল 'রাজাদের শহর'। 1821 সালে পেরু স্বাধীন হয়। লিমার চারধারে ছিল প্রাচীর। 1870 সালে ওই প্রাচীর ভেঙে ফেলে দেওয়া হয়। লিমার জনসংখ্যা খুব দ্রুত বাড়তে থাকে। এখন পুরো পেরুর এক তৃতীয়াংশ লোকের বাস এই লিমা শহরে। এই বাড়তি লোকের চাপ সামলাতে গিয়ে কাহিল লিমা। অট্টালিকার পাশাপাশি বড়-বড় বস্তি।

ট্যাক্সিতে বসে এসব ভাবতে-ভাবতে যাচ্ছিল অনিলিখা। আজ রাত ন'টায় হোটেলেই মিটিং। তাতেই খোলসা হবে আসার উদ্দেশ্য। রিকোর্ডো গোপনীয়তার কারণে কিছু বলতে চায়নি।

হোটেলে চেক-ইন করে তাড়াতাড়ি ডিনার করে নিল অনিলিখা। রিকার্ডোর সঙ্গে একেবারে মিটিং-এই দেখা হবে।

খেয়ে উঠে একবার হোটেলটা ঘুরে দেখে নিল অনিলিখা। 1927 সালের হোটেল। খুব সুন্দর স্প্যানিশ স্থাপত্যে তৈরি। সঙ্গে গলফ কোর্সও আছে।

মিটিং-এ যাওয়ার পথে রিকার্ডোর সঙ্গে দেখা। ও অনিলিখাকে খুঁজছিল। রিকার্ডো পেরুরই লোক। স্নাতকোত্তর পড়াশুনোর সময় আমেরিকাতে অনিলিখার সঙ্গে আলাপ। প্রাণীতত্ত্ববিদ হিসেবে রিকার্ডো পেরুতে খুব নাম করেছে।

ওরা হোটেলের টিটিকাকা কনফারেন্স রুমে এসে ঢুকল। লেক টিটিকাকা, পেরু আর বলিভিয়ার সীমান্তে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বোচ্চ নাব্য লেক। সমুদ্রের

মতো বিশাল। ইনকাদের মতে, পৃথিবীতে প্রথম মানবজীবন শুরু হয় এখানেই। এর জল থেকে প্রথম ইনকা ম্যানকো ক্যাপাক আর তার বোন ম্যামা ওকলো বেরিয়ে এসে ইনকা সাম্রাজ্য স্থাপন করে। তারই নামে এই কনফারেন্স রুম। এই বিশাল ঘরের দেওয়াল জুড়ে টিটিকাকা লেকের ছবি।

বিশাল কাচের গোল টেবিল। কয়েকজন ইতিমধ্যেই বসে আছেন। রিকার্ডো এক-এক করে অনিলিখার সঙ্গে সবার আলাপ করিয়ে দেয়। মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই মিটিং শুরু হল। মাথায় চামড়ার টুপি পরা এক বছরষাটেকের বৃদ্ধ চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলতে শুরু করেন,—আমাকে আপনাদের অনেকে নিশ্চয়ই চেনেন। আমি ডক্টর গেরার্ড। দক্ষিণ আমেরিকার সবথেকে পুরোনো ইউনিভার্সিটি—স্যান মার্কোস ইউনির্ভাসিটির ভাইস চ্যান্সেলার। আর পেরুর মানবসম্পদ দপ্তরের বিশেষ উপদেষ্টা। আমার সঙ্গে আছেন মানবসম্পদ দপ্তরের সেক্রেটারি অ্যারন। অ্যারনকে আমি অনুরোধ করছি এ-মিশনের উদ্দেশ্যে বলতে।

অ্যারন, গেরার্ডের পাশেই বসে ছিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, বেশ সুদর্শন। পরনে নীল স্যুট-টাই। উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে সম্ভাষণ করে বলতে শুরু করলেন,—আমার সৌভাগ্য আপনাদের মতো দেশ-বিদেশের এতজন জ্ঞানীগুণী লোককে একসঙ্গে দেখার ও কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি। ডক্টর গেরার্ড আপনাদের বিস্তারিত বলার আগে আমি সংক্ষেপে আমাদের প্রজেক্টের উদ্দেশ্যে বলার চেষ্টা করছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন পেরুতে 42টা আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস। এদের বড় একটা অংশ থাকে আমাজনের বেসিনে। এদের বাদ দিয়ে পেরুকে ভাবা যায় না। স্প্যানিশ আমাদের জাতীয় ভাষা হলেও পনেরোটা আদিবাসী ভাষা সরকারিভাবে স্বীকৃত। অর্ধেকের মতো লোক আজও কেচুয়া ভাষায় কথা বলে, যা ছিল ইনকাদের ভাষা।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, পেরুর এই আদিবাসীদের আমরা আজও মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত করতে পারিনি। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারিনি। আজও এদের বেশিরভাগ এমন জীবনযাপন করে যা গত দশ হাজার বছরেও পরিবর্তিত হয়নি। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ইদানীং এদের সংখ্যা কমে আসছে। অতীতে যখনই এরা বাইরের লোকের সংস্পর্শে এসেছে, নানান ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে। মিস্‌ল্‌স্‌, স্মলপক্স—এরকম বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা এদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। আমরা জানতে চাই, কী কারণে এদের সংখ্যা এত দ্রুত কমে আসছে, কীভাবে আমরা এদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। কী-কী এদের প্রধান সমস্যা। আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি।

আপনাদের মনে হতে পারে যে, এজন্য বাইরে থেকে আপনাদের নিয়ে আসা হয়েছে কেন, এজন্য তো পেরুর বিজ্ঞানীরাই আছেন। আমরা আমাদের

বিজ্ঞানীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল। তাই টিমে এখানকার লোকও আছেন, যাঁরা আমাজনের সম্বন্ধে, এখানকার উপজাতিদের সম্বন্ধে, এখানকার জৈব বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কিন্তু দীর্ঘদিনের এই আদিবাসী সমস্যা সমাধানের জন্য আজ অন্যভাবে ভাবার দরকার। বিদেশের বিজ্ঞানীদের কাছে পেরুর আদিবাসী, এখানকার মেসটিজো আর স্প্যানিশ জনসাধারণের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই। এই কমিটির রিপোর্টকে তাই কেউ পক্ষপাতদুষ্ট বলতে পারবে না।

একজন প্রশ্ন তুললেন,—অ্যারন, আমি শুনেছি অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অদ্ভুত ঘটনা দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকে নাকি হঠাৎ করে হারিয়ে যাচ্ছে। কেউ-কেউ ফিরে আসে, কিন্তু আসার পর থেকে আর কাউকে চিনতে পারে না।

—ড. জন, আপনি ঠিকই শুনেছেন। তবে এরকম আজগুবি কথা মাঝেমধ্যেই শোনা যায়। তার একটা বড় কারণ, এসব আদিবাসীরা ব্ল্যাক ম্যাজিক, ভূত, কাল্পনিক ঘটনা খুব সহজে বিশ্বাস করে। আমরাও এদের কথা ভালো বুঝি না। অনেক সাংবাদিক আছে, যারা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে গল্প লিখতে বসে যায়। আমি আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ রাখছি। কোনও মতেই যেন এই টাস্ক কমিটির রিপোর্ট, কোনওরকম খবর বাইরে না যায়। এবার আমি ড. গেরার্ডকে বিস্তারিত ভাবে বলতে অনুরোধ করব।

॥ লিমা, পেরু, 16 মে ॥

কাল থেকেই কাজে বেরিয়ে পড়তে হবে। লিমা দেখার জন্য শুধু আজকের দিনটাই আছে। অনিলিখাকে লিমা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য রিকার্ডো খানিকটা সময় বের করে নিয়েছে। শহরের কেন্দ্রে প্লাজা ডে আর্মাস—বিশাল চৌকাকৃতি খোলা জায়গা। ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই, থিয়েটার, বন্দিদের ফাঁসি দেওয়া নানান কাজে 1535 সাল থেকে এই জায়গা ব্যবহার করা হত। লিমা শহরের কেন্দ্র হল এই প্লাজা ডে আর্মাস। স্পেন সাম্রাজ্যের স্থাপত্যের বেশিরভাগ চিহ্নই এই কেন্দ্রে। ওই সময়কার চার্চ, অট্টালিকা সব প্লাজা ডে আর্মাস-কে কেন্দ্র করে। এর পাশেই একটা কফি শপে বসে কফি খেতে-খেতে কথা হচ্ছিল অনিলিখা আর রিকার্ডোর।

—তাহলে কালকেই আমরা বেরিয়ে পড়ছি।

—হ্যাঁ, এখান থেকে কুজকো পর্যন্ত ফ্লাইটে। সেখান থেকে চাটার্ড বিমানে 45 মিনিটে বোকা মানু বিমানবন্দর। তারপরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নৌকাযাত্রা। মনু রিজার্ভ ফরেস্টে আমরা যেখানেই যাই না কেন ডিঙিনৌকা করে যেতে হবে।

বায়ো-ডাইভার্সিটিতে মনু রিজার্ভ ফরেস্টের স্থান সারা পৃথিবীতে একনম্বর। এলাকাটা আয়তনে সুইজারল্যান্ডের অর্ধেক মতো হবে। পুরো এলাকাটাই রিজার্ভড এরিয়া। এর মধ্যে আমরা একটা এলাকায় যাব যেখানে বাইরের লোকেদের আসা নিষিদ্ধ। শুধু আদি উপজাতিরা থাকে। আমাদের জন্য বিশেষভাবে অনুমতি নেওয়া হয়েছে।

—তা আমাদের টিমটা কেন ও-দিক দিয়ে যাচ্ছে বলো তো? আমাজনে যাওয়ার জন্য তো সবাই ইকুইটোস হয়েই যায়।

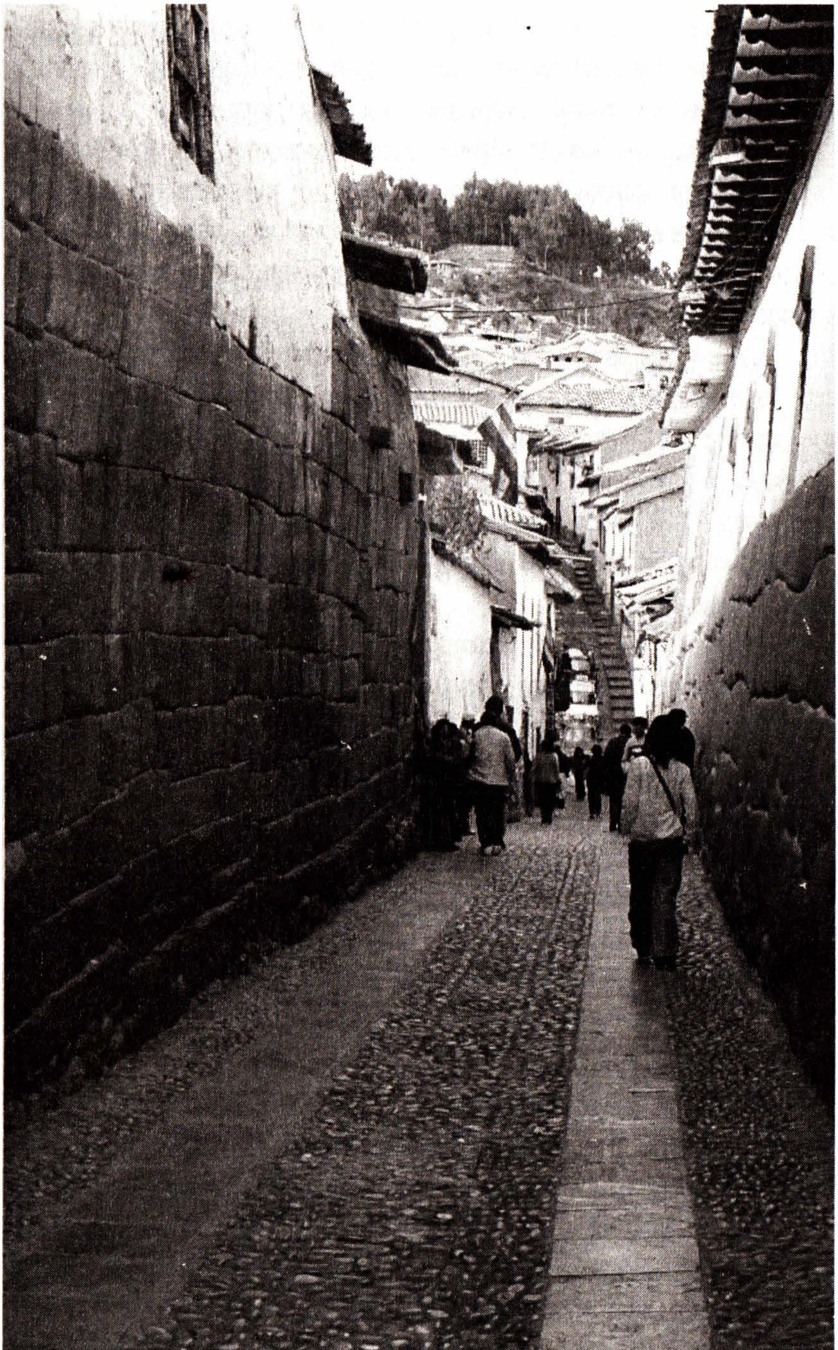
—ইকুইটোস হয়ে পেরুর উত্তর আমাজন বেসিনে যাওয়া যায়। অন্য টিমটা ইকুইটোস হয়েই আমাজনে ঢুকবে। আমাদের পথ কিন্তু অনেক বেশি আকর্ষণীয়। তা ছাড়া মনুর জঙ্গলে অনেক কম পর্যটক যায়। দক্ষিণ পেরুর এদিকে অনেক উপজাতি আছে, যাদের কথা পেরু সরকার জানেই না। মনুর জঙ্গলের উপকণ্ঠে যেসব উপজাতি আছে তাদের সংখ্যা কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে। আমার ধারণা এই এলাকাতেই আসল রহস্য লুকিয়ে আছে। আমি আগেই ড. গেরার্ডকে বলেছিলাম যে, আমি এ-এলাকাটা দেখতে বেশি আগ্রহী। তাই আমাকে এ-এলাকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গতকালের কনফারেন্সে ড. গেরার্ড টিমটাকে পাঁচজন-পাঁচজন করে দুটো দলে ভেঙে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, যাতে বেশি উপজাতি এলাকা কম সময়ে ঘোরা যায়। রিকার্ডো একটা দলের দায়িত্বে। রিকার্ডোর টিমে আছে অনিলিখা, উপজাতি বিশেষজ্ঞ মিগুয়েল, শিকারি ও আমাজন বিশেষজ্ঞ ফার্নান্ডো আর ফিল্ড বায়োলজিস্ট রবার্তো। রিকোর্ডোর টিমের কাজ দক্ষিণ-পূর্ব পেরুর উপজাতিগুলোকে কনট্যাক্ট করা। অন্য টিমের প্রধান ড. আর্নেস্টো। ওই টিমের কাজ উত্তর-পূর্ব পেরুর উপজাতিগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা।

—আমরা যেখানে যাব সেখানে কিন্তু ডায়েরিয়া বা ম্যালেরিয়া হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এখানকার ম্যালেরিয়ার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনও ওষুধ নেই। তাই সবসময় মশার মলম লাগাতে হবে যাতে মশারা ধারেকাছে না আসতে পারে।

—হ্যাঁ, সেসব দিক দিয়ে আমি প্রস্তুত। তা, আমরা ওই জঙ্গলে ঠিক কোথায়-কোথায় যাব—সেসব প্ল্যান করেছ?

—হ্যাঁ, আমার কাছে সেসব ইনফরমেশন আছে। আমি জানি ঠিক কোথায় কোন উপজাতিরা থাকে। তবে তা যথেষ্ট নয়। অর্ধেক উপজাতিদের কথা আমরা জানিই না। তুমি ড. মিগুয়েলের সঙ্গে কথা বললেই বুঝবে। ওঁর সঙ্গে অনেক উপজাতি প্রধানের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরা আমাদের মতো লোকেদের কাছে আসা পছন্দ করে না। অনেক ক্ষেত্রে বিষতীর ছোঁড়ে।



মিগুয়েলের সাহায্য ছাড়া এদের সঙ্গে যোগাযোগ অসম্ভব। অনেক উপজাতি প্রধানই মিগুয়েলের খুব বন্ধু। ওইসব উপজাতি প্রধানেরা তাদের সব কথা আমাদেরকে জানাবে। উপজাতির অন্যান্য লোকেদের কাছে নিয়ে যাবে।

অনিলিখা আর রিকার্ডো কফিশপ থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকল। কিছু সুন্দর-সুন্দর ম্যানসন আছে মাঝেমধ্যে। তাদের ব্যালকনিগুলো রঙিন কাচ দিয়ে ঘেরা। ভেতর থেকে রাস্তার লোকেদের দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। উচ্চবিত্ত স্প্যানিশরা এসব বাড়িতে থাকত একসময়।

ঘুরতে-ঘুরতে ওরা গেল 'ইগ্‌লেশিয়া ডে স্যান ফ্রান্সিসকো' চার্চে। 1674 সালে তৈরি। চার্চের ভেতরের দেওয়ালে ভারি সুন্দর নকশা। এই আঁকার স্টাইলকে বলে মুজেদার। এ ধরনের পেন্টিং পেরুর বাইরে আর কোথাও দেখা যায় না। চার্চ থেকে বেরিয়ে খানিকটা হাঁটার পর অনিলিখার মনে হল, কেউ যেন ওদের ফলো করছে। টুপি মাথায় রঙচঙে ঢলঢলে জামা পড়া একজন স্থানীয় লোককে বেশ কয়েকবার অনিলিখা লক্ষ করেছে। কফিশপেও অন্য টেবিলে বসে ছিল। চার্চেও একঝলক দেখেছে।

ট্রাভেলার্স চেক ভাঙানোর জন্য অনিলিখা একটা ব্যাংকে ঢুকল। লিমাতে বড় জায়গাগুলোতে ডলার নেয়। কিন্তু প্রত্যন্ত জায়গায় এখানকার স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন হবে। এখানকার মুদ্রা হল 'সল্‌স'। অনিলিখা বেশ কিছু ডলার সলে ভাঙিয়ে নিল। তখনই দেখল ওই লোকটা এনকোয়ারি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে।

॥ কুজকো, পেরু 17 মে, সকাল দশটা ॥

'বিয়েনভেনিডোস এ্যা ল্যা সিউদাদ ইম্‌পেরিয়াল ডেল কুজকো।' ফ্লাইট অ্যাটেন্ড্যান্ট ঘোষণা করল প্লেন কুজকো পৌঁছে গেছে। আক্ষরিক অনুবাদ—'রাজকীয় শহর কুজকোতে আপনাকে স্বাগত জানাই।'

অনিলিখারা ল্যানপেরুর ফ্লাইটে লিমা থেকে কুজকো পৌঁছোল। এখান থেকে পরবর্তী যাত্রা পরের দিন। চার্টার্ড বিমানে বোকা মানু। তাই একদিন কুজকোতে কাটাতে হবে। সমুদ্রতল থেকে 11,500 ফুট উঁচুতে কুজকো ন'শো বছরের পুরোনো শহর। পাঁচশো বছর ধরে ইনকা সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এই কুজকো। উত্তরে ইকুয়েডর থেকে পেরু, বলিভিয়া হয়ে দক্ষিণে চিলি অবধি পা রেখেছিল এই বিশাল সাম্রাজ্য। 1532 সালে স্পেনের ফ্রানসিসকো পিজ্যারো মাত্র কয়েকশো সেনার বাহিনী নিয়ে ইনকাদের পরাস্ত করে। বন্দি করে শেষ ইনকা সম্রাট অ্যাতাহুয়ালপাকে।

তারপর থেকেই পেরুতে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের সূচনা।

হোটেলে ঢোকামাত্রই ফোনটা পেল অনিলিখা। 'সেটি' থেকে ফোন। ম্যানিটো স্প্রিং-এর গুহার নকশাটার কথা অনিলিখা 'সেটি'-কে জানিয়েছিল। নকশার যাবতীয় তথ্য পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকেই মাঝেমধ্যে ফোন পায় অনিলিখা। কিন্তু আজকের ফোনটা অন্যরকম। ফোনে ডিরেক্টার জিল আর জিলের টিমের কয়েকজন বিজ্ঞানী। এ-কয়দিন নকশার ব্যাপারে কিছুই বলতে পারেনি।

আজ কিন্তু জিল অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য সুরে শুরু করল। 'অনিলিখা, আমরা নকশার রহস্য হয়তো আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই উদ্ধার করতে পারব। তোমাকে আমরা আগে জানাইনি—ঠিক এরকমই একটা নকশা আমাদের কম্পিউটারে কয়েকদিন আগে আসে। আমাদের গ্যালাক্সিরই অন্য একটা গ্রহ থেকে। গ্যালওয়ে ও আরও কয়েকটা ক্রপ সার্কেল, তোমার দেখা গুহার নকশা—সবই যে একই গ্রহের প্রাণীদের পাঠানো বা করা তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। আমাদের ধারণা কয়েক লক্ষ বছর আগে যখন ওরা পৃথিবীতে প্রথম পা রাখে, তখন ওরা পৃথিবীতে কোনও বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজ পায়নি। তাই ওরা ওদের উপস্থিতির কথা এমন কিছু জায়গায় রেখে যায় যা সহজে নষ্ট হবে না। গুহার সংকেত সেজন্যই করা। উদ্দেশ্য, কোনওদিন যদি এ-গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব হয়, তাহলে তারা এ-সংকেত উদ্ধার করতে পারবে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ওদের চিন্তাভাবনা সঠিকই ছিল। যেখানে ওদের গ্রহ থেকে আমাদের গ্রহে আলোর আসতেই কয়েকবছর সময় লেগে যায়, সেখানে বারবার যোগাযোগ করা খুব শক্ত। আর সংকেতটাই তার পরীক্ষা। এ পরীক্ষা পাস করবে শুধু বুদ্ধিমান প্রাণীরা।

অনিলিখা বলে ওঠে,—তাহলে ওরা এখন বারবার সংকেত পাঠাচ্ছে কী করে?

—আমার বিশ্বাস, ওদের সভ্যতা হয়তো এখন কয়েক লক্ষ বছর পুরোনো। স্বাভাবিকভাবেই তা কতটা উন্নত তা আমাদের ধারণারও বাইরে। আমরা মোটে ছয় হাজার বছরে যদি এতটা উন্নতি করে থাকতে পারি, তাহলে ওরা কয়েক লক্ষ বছর ধরে কতটা উন্নত হয়েছে ভাবতেই পারছ! এখন হয়তো ওরা ইচ্ছেমতো অন্যগ্রহদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। আগে ওরা এটা পারত না।

—কিন্তু বারবার একই সংকেত পাঠিয়ে লাভ?

—এটা আমাদেরও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু পরে আমরা লক্ষ করেছি, নকশাগুলো এক মনে হলেও আসলে প্রত্যেকটার মধ্যেই পার্থক্য আছে। নকশায় যে বৃত্তগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটার কেন্দ্র থেকে তার আগের বৃত্তের ওপর যে দুটো চাপ আঁকা যায়, তাদের মধ্যের কোণের আস্তে-আস্তে পরিবর্তন হয়েছে। আর এই পরিবর্তনের হার প্রত্যেকটা নকশায় ভিন্ন। আমাদের ধারণা এর মধ্যেই আছে

নকশার সমাধান সূত্র। যখন কেউ কাউকে চিঠি লেখে তাতে দুটো তথ্য অবশ্যই থাকে। কে লিখছে? আর কীজন্য লেখা হচ্ছে?

'কে লিখছে'—তা এই নকশার প্যাটার্নটা জানায়। আর কীজন্যে লেখা হচ্ছে—তা এই কোণের পরিবর্তনের মাধ্যমে যে সমীকরণ তৈরি হয়, তার মধ্যে থাকে।

—অসাধারণ। তা আপনার কি মনে হয় ওরা আমাদের কোনও ক্ষতি করতে চাইছে?

—মনে তো হয় না। তাহলে ওদের কাছে অন্য অনেক উপায় ছিল। প্রশ্ন এখন এত ঘনঘন বার্তা পাঠিয়ে ওরা ঠিক কী জানাতে চাইছে? ওদের স্বার্থ কি? ওদের কেউ কি পৃথিবীতেই আছে?

আরও খানিকক্ষণ কথা হল। সঙ্কেত পুরোপুরি উদ্ধার হলেই জিল অনিলিখাকে জানাবে। আপাতত এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলা চলবে না। তাহলে মিডিয়া পাগল করে তুলবে।

॥ কুজকো, পেরু 17 মে, বিকেল ছ'টা ॥

বিকেলের দিকে অনিলিখা, রিকার্ডো ও ফিল্ড বায়োলজিস্ট রবার্তো একসঙ্গে বেরোল কুজকো ঘুরে দেখতে। প্রতি বছর লক্ষ-লক্ষ পর্যটক আসে কুজকো দেখতে। ছোট শহর। একদিনেই পুরো দেখা যায়। কুজকো হয়ে তারা যায় মাচুপিচু দেখতে। পনেরো শতকে মাচুপিচু ছিল ইনকাদের উচ্চবিত্তদের প্রিয় জায়গা। স্প্যানিশ আক্রমণের পরে মাচুপিচু অদ্ভুতভাবে হারিয়ে যায়। লোকেরা ভুলে যায় এ শহরের অস্তিত্ব। শহরের লোকেরাও কীভাবে যেন উধাও হয়ে যায়। প্রায় চারশো বছর পরে ১৯১১ সালে আমেরিকার হিরাম বিগহ্যাম এই হারিয়ে যাওয়া শহর ফের খুঁজে পান। ইনকাদের তৈরি পাথরের দেওয়াল, মন্দির স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন মাচুপিচুতে ছড়িয়ে আছে।

তবে কুজকোর স্থানমাহাত্ম্যও কিছু কম নয়। ইনকা আর স্প্যানিশ সভ্যতা হাত ধরাধরি করে আছে এখানে। ভূমিকম্পের জন্য অনেক স্প্যানিশ বিল্ডিং ভেঙে গেছে। কিন্তু ইনকাদের পাথরের দেওয়াল আজও অটুট আছে। কুজকো শহরের কেন্দ্রে প্লাজা ডে আর্মার্স। শহরের উপরের দিকে এই এলাকা। এখান থেকে সরু-সরু রাস্তা নীচের দিকে নেমে গেছে। বেশিরভাগ রাস্তা এত সরু যে পায়ে হেঁটেই ঘোরা ভালো। পাথরের রাস্তা। চড়াই মাঝেমধ্যে এত বেশি যে একটু হাঁটলেই দম বন্ধ হয়ে আসে।



অনিলিখার অস্বস্তি হচ্ছে দেখে রবার্তো বলে উঠল,—চলো একটু কোনও জায়গায় বসা যাক। এখানকার উচ্চতার জন্য অনেকেরই আসার পরপর শরীর খারাপ লাগে। অক্সিজেনের অভাব। এরা বলে 'সোরোসে'। এখানে কোকা পাতা দিয়ে একধরনের চা তৈরি হয়। যেমন টেস্ট, তেমনই ম্যাজিকের মতো কাজ করে 'সোরোসে' কাটিয়ে দেয়। চল, কোকাটী খাওয়া যাক।

—না, আমি ঠিক আছি। হাতে তো সময় বেশি নেই। একটা অ্যালাপাকার শোয়েটার কেনার ইচ্ছে আছে। খুব নরম হয় শুনেছি।

—হ্যাঁ, খুব ভালো। তবে নকল কিনে ঠকো না। রিকার্ডোকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি ততক্ষণ এখানকার বিখ্যাত স্যান্টো ডোমিঙ্গো চার্চ থেকে ঘুরে আসি।

অনিলিখা আর রিকার্ডোর সোয়েটার কিনতে বেশি সময় লাগল না। দোকান থেকে বেরিয়ে ওরা রাস্তা ধরে উপরের দিকে হাঁটতে লাগল।

প্লাজা ডে আর্মাস-এর ওপরের দিকে পুরোনো কুজকো শহর। নীচের দিকে নতুন কুজকো। সরু-সরু রাস্তার ওপরে কালো ফলকে রাস্তার নাম লেখা আছে।

রিকার্ডো বলে,—এখন সব রাস্তার নাম আবার 'কেচুয়া'-তে লেখা হচ্ছে। চেষ্টা করা হচ্ছে ইনকাদের ঐতিহ্য বজায় রাখার।

অনিলিখা বলে,—চারশো বছর স্প্যানিশ শাসনের পরেও এখানকার লোকেরা কিন্তু ইনকাদের কথা ভোলেনি। এখনও দেখছি চারদিকে লোকে কেচুয়া ভাষায় কথা বলে। ইন্ডিয়ানরা নিজেদের স্বাতন্দ্র্য হারায়নি।

—ঠিকই বলেছ। ইন্ডিয়ানরা কখনওই স্প্যানিশদের বিশ্বাস করেনি। করবেই বা কী করে। যেভাবে এদের শেষ ইনকা সম্রাটকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল! 1527 সালে অন্তর্দ্বন্দ্বে ইনকা সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পাঁচ বছর যুদ্ধের পর অ্যাতাহুয়ালপা রাজা হয়। কিন্তু কুজকোতে অভিষেকের কয়েকদিন আগে 1532 সালে স্পেনের ফ্রান্সিসকো পিজারো, কুজকো আক্রমণ করে অ্যাতাহুয়ালপাকে বন্দি করে। পরে মেরেও ফেলে।

—তবে অ্যাতাহুয়ালপা প্রথমে ভেবেছিল পিজারো স্পেন থেকে সৌজন্য সফরে এসেছে। তাই পিজারোর নিমন্ত্রণ রাখতে ছয় হাজার অস্ত্রহীন রক্ষী নিয়ে পিজারোর সঙ্গে দেখা করে। পিজারো তখন রক্ষীদের ওপর গুলি চালায়। হাজার-হাজার ইন্ডিয়ান মারা যায়। অ্যাতাহুয়ালপাকে বন্দি করা হয়। বলা হয়, একটা বাইশ ফুট বাই সতেরো ফুটের ঘর সোনায় আর আরেকটা তার দ্বিগুণ সাইজের ঘর রূপোয় ভরিয়ে দিলে ইনকা রাজাকে মুক্তি দেওয়া হবে। ইনকাদের কাছে সোনা ছিল সূর্যদেবতার ঘাম। অত্যন্ত পবিত্র জিনিস। কিন্তু তার কোনও আর্থিক

মূল্য ছিল না। অ্যাতাহুয়ালপা তার কথা রাখে। রাখেনি পিজারো। ঘর সোনাবোঝাই করার পরও ইনকা রাজাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। অ্যাতাহুয়ালপাকে তার প্রজাদের সামনে মেরে ফেলা হয়।

—তাই নাকি? আমার এত সব জানা ছিল না। রিকার্ডো বলে ওঠে।

—এখানেই সব শেষ নয়। পিজারোর জানা ছিল না যখন অ্যাতাহুয়ালপাকে মারা হয়, তখন ইন্ডিয়ানরা তাদের রাজার মুক্তির জন্য যাবতীয় সোনা নিয়ে পিজারোর কাছে আসছিল। তাতে ছিল 750 টন সোনা। ষাট হাজার লোক ওই সোনা নিয়ে ক্যাজামার্কায় তাদের রাজাকে ছাড়াতে আসছিল। সোনার দায়িত্বে ছিল ইনকারাজার বিশ্বস্ত সেনাপতি রুমিনাহুই। মৃত্যুর খবর আসতেই রুমিনাহুই রাতারাতি সেই যে সোনা লুকিয়ে ফেলে আর তার খোঁজ মেলেনি।

রিকার্ডো কিছু বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর ফোনটা বেজে উঠল। ফোনে কারওর সঙ্গে স্প্যানিশে কথা বলল দু-মিনিট। ফোন শেষ হলে উত্তেজিতভাবে রিকার্ডো বলে ওঠেন,—রবার্তোকে কেউ গুলি করেছে। মারা যায়নি, তবে গুরুতর আহত। পুলিশ ওর ফোন থেকে আমার নাম্বার পেয়ে ফোন করেছে। এক্ষুনি হাসপাতালে যেতে হবে।

রিকার্ডো আর অনিলিখা রাস্তার পাশের দেড়ফুট চওড়া ফুটপাত ধরে ছুটতে শুরু করল। খাড়া রাস্তা। মাঝে-মাঝে ধাপ-ধাপ করা ফুটপাত। তারই মধ্যে ছোট-ছোট ভেড়ার মতো দেখতে অ্যালপাকা দাঁড়িয়ে। পাশ কাটিয়ে ছুটতে গিয়ে মাঝেমধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। হঠাৎ কোত্থেকে একটা বড় পাথর অনিলিখার দিকে ছুটে এল। সামনে একটা লামা এসে পড়ায় অনিলিখা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তা না হলে ওর মাথাটা থেঁতলে যেত। মুহূর্তে সামলে নিয়ে যেদিক থেকে পাথরটা এসেছে সেদিকে ঘুরে তাকাল অনিলিখা। পাশের বাড়ির টালির ছাদ থেকে কেউ হুড়মুড় করে রাস্তার অন্যদিকে নেমে যাচ্ছে। ধরার কোনও উপায় নেই। লিমায় ফলো করা, রবার্তোকে গুলি, এখন আবার অ্যাটাক—কেউ কি এই মিশন পণ্ড করতে চাইছে! —অনিলিখা ভাবতে থাকে।

॥ মনু রিজার্ভ ফরেস্ট, আমাজন, পেরু, 20 মে ॥

—কী বুঝছ অনিলিখা? এর নামই আমাজন। রিকার্ডো বলে উঠল। অনিলিখাদের বোট আমাজনের এক শাখানদী ধরে এগিয়ে চলেছে।

গতকাল ওরা মনু রিজার্ভ ফরেস্টে এসে পৌঁছেছে। কুজকো থেকে বোকা মানু ওরা এসেছে চার্টার্ড বিমানে। ছোট বিমান—সব মিলিয়ে সাতজন উঠতে পারে,

পাইলট বাদে। বিমানে আসার সময়ই জায়গাটার দুর্গমতার খানিকটা পরিচয় পেয়েছে অনিলিখা। নীচে আন্দেজ পাহাড়—আর শুধু বন-বনানী। যত এগিয়েছে আস্তে-আস্তে গহন বনের কাছে যেন হার মেনেছে পাহাড়ও।

বোকা মানু ছোট-ছোট বিমান নামার জন্য তৈরি ছোট বিমান বন্দর। মনু জঙ্গলের ঠিক বাইরেই। ওখান থেকে মোটরাইজ্‌ড স্পিড বোটে করে জঙ্গলে ঢুকতে হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে মনু লজে ওদের থাকার ব্যবস্থা করা ছিল। বোটে করে মনু লজে পৌঁছতে লেগেছে দু-ঘণ্টা। গতকাল ওরা আর কোথাও বেরোয়নি। আজ ভোর হতেই বেরিয়ে পড়েছে।

আপাতত ওরা কোম্নিপাতা নদী ধরে এগিয়ে চলেছে। আমাজন বেসিনে একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার একমাত্র উপায় এই বোট। কাদাটে ঘোলা জল। মাথা তুলে ওপরে তাকালে শুধু গাছ আর গাছ।

শেষ কয়েকমাসের বৃষ্টিতে জলতল অনেক উপরে উঠে এসেছে। অনেক গাছের মাঝামাঝি অবদি জল। গাছের ডাল ধরা যায় বোট থেকেই।

ওরা চলেছে কোকামা উপজাতি এলাকায়। কোকামা উপজাতি প্রধানকে মিগুয়েল খুব ভালো করে জানেন। ওদের সুবিধে-অসুবিধে সবকিছুর খবরই জানা যাবে উপজাতি প্রধানের কাছ থেকে। তবে এরা থাকে জঙ্গলের অনেকটা ভেতরে। তাই পৌঁছতে দু-ঘণ্টা লেগে যাবে।

—আমাজন নামটা কীভাবে এসেছিল জানো তো? ফার্নান্ডো অনিলিখাকে জিগ্যেস করল।

অনিলিখা ঘাড় নেড়ে না বলতে ফার্নান্ডো বলে উঠল,—1541-42 সালে স্পেনের ফ্রান্সিসকো ডে ওরেল্যানা পেরুর ন্যাপো নদীর মুখ থেকে আমাজন যেখানে আতলান্তিক সাগরে গিয়ে পড়েছে, সে জায়গা পর্যন্ত নৌকোতে যান। প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার। পথে নাকি ওরেল্যানার দলের ওপর মেয়ে যোদ্ধারা তিরধনুক নিয়ে আক্রমণ করে। গ্রিক মিথোলজিতে নারী যোদ্ধাদের আমাজন বলা হত। সেই অনুসারে ওরেল্যানা ওই যোদ্ধাদের নাম দেন আমাজন। পরে ওটাই নদীর নাম হয়ে যায়।

—এ-নদীপথে এরকম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অভিযান কিন্তু মুখের কথা নয়। তা, এরকম কত শাখানদী আছে আমাজনের?

—হাজারেরও বেশি। তারমধ্যে 17টা 1000 মাইলেরও বেশি লম্বা। জানোই তো, আমাজন পৃথিবীর যে-কোনও নদীর থেকে বেশি জল বহন করে। মিসিসিপি, নীল ও ইয়াংজি নদী একত্রে যত জল বহন করে, একা আমাজন তার থেকে বেশি জল বহন করে। ভাবা যায়!

—আরে, এখানে ডলফিন! ওই যে জলে খেলা করছে। অনিলিখা আনন্দে

চিৎকার করে ওঠে।

তিনটে পিংক্ ডলফিন কুইক্-কুইক্ আওয়াজ করে জলের মধ্যে খেলা করতে-করতে উলটো দিকে চলে গেল। সাতফুটের মতো লম্বা। মাঝে-মাঝে জল ছেড়ে লাফিয়ে উঠছে।

—এরা নাকি অনেকসময় এখানকার জেলেদের বিপদের হাত থেকে বাঁচায়। তাই এখানকার লোকেরা ডলফিনদের খুব পছন্দ করে। আমাজনই একমাত্র নদী যেখানে ডলফিন আছে। ফার্নান্ডো বোঝায়।

অনিলিখা মুগ্ধ হয়ে দু-ধারের গাছ দেখতে থাকে। কতরকমের পাখি। সারা পৃথিবীর অর্ধেক প্রজাতির পাখি এই আমাজনে। মনুর জঙ্গলের কিছু অংশ প্রায় বারোহাজার ফুট উচ্চতায়। আবার কোন-কোন জায়গা মোটে হাজার ফুট উঁচু। এজন্যেই এখানে এত প্রজাতির পাখি, গাছ—এত ধরনের জীবজন্তু।

ফার্নান্ডো আমাজনের জঙ্গল চষে বেরিয়েছে। তবে পারমিট না থাকায় মনুর জঙ্গলে আসতে পারেনি। তাই এবার ও বেশ খুশি।

একটা ভোঁদর জলে সাঁতরাচ্ছে। এদের বেশি দেখা যায় না। একটা অদ্ভুত চেহারার পাখি জল থেকে উঠে কাঠবেড়ালীর মতো গাছ বেয়ে উঠে গেল। নীল মুখ, লাল চোখ, লাল পালক।

'হোয়াট্‌জিন'।—রিকার্ডো বলে উঠল—'যেমন অদ্ভুত দেখতে, তেমনই অদ্ভুত হাবভাব। জলে নেমে ডানা ভিজে গেছে। তাই নখ দিয়ে গাছ বেয়ে বাসায় ফিরে গেল।'

নদী বেয়ে নৌকো চলেছে। ফার্নান্ডো বলল,—কাছে পিঠে কোথাও একটা জাগুয়ার আছে। ওই যে গাছে আঁচড়ের দাগ দেখছ, ওটা জাগুয়ারের। ওরা এভাবে ওদের জায়গা নির্দিষ্ট করে। গাছে আঁচড় দিয়ে গায়ের গন্ধ রেখে দেয়, যাতে আরেকটা জাগুয়ার ওই এলাকায় না আসে।

—তুমি জাগুয়ার দেখেছ?

—হ্যাঁ, দেখব না! এ-এলাকায় অনেক জাগুয়ার আছে। কয়েক বছর আগে একটা জাগুয়ার সংরক্ষণ প্রকল্পে কাজ করছিলাম। আমার কাজ ছিল জাগুয়ারদের গলায় রেডিও কলার পরানো, যাতে স্যাটেলাইট দিয়ে ওদের গতিবিধি দেখা যায়।

খানিক বাদে নদী অনেক চওড়া হয়ে গেল। নদী স্থলভাগের অনেকটা জায়গায় থাবা বসিয়েছে। মাঝে-মাঝে নদীর দু-ধারে বিস্তৃত বালুচর। মিগুয়েল জানাল,—কোকামা উপজাতি এলাকা এসে গেছে। বোট দাঁড় করাতে হবে।

বালুচরে দুটো বাচ্চা ছেলে বালি দিয়ে খেলা করছে। কাছে যেতে দেখা গেল, বালি খুঁড়ে কচ্ছপের ডিম বার করছে। অনিলিখা অন্যমনস্ক হয়ে আগে-

আগে হাঁটছিল। হঠাৎ ফার্নান্ডো চেঁচিয়ে উঠল,—সাবধান! সামনে একটা কুমির শুয়ে আছে। আমি জানি তুমি লক্ষ করোনি। এরা খুব হিংস্র হয়।

—আসলে বাচ্চাদুটো এখানে খেলছে দেখে আমি ভাবতেই পারিনি যে ওটা কুমির হতে পারে।

—জঙ্গলে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। এখানকার বাচ্চারাও এসবে অভ্যস্ত। এই কুড়ি ফুট কুমিরের একটা প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। অ্যানাকোন্ডা। জঙ্গলে যে-কোনও জায়গায় দেখা মিলতে পারে। খেয়াল রেখো।

ফার্নান্ডোর কথায় ছেদ পড়ল। উপজাতি প্রধান এসে গেছে। তার সঙ্গে নারী-পুরুষ-বাচ্চা মিলিয়ে জনাতিরিশের একটা দল। কারও গায়ে কোনওরকম পোশাক নেই। মুখে নানা রং করা, কানে-গলায় হাড়ের কাঠের অলংকার। হাতে গাছের পাতা বাঁধা। মিগুয়েলকে সবাই বেশ পছন্দ করে বলে মনে হল। অনিলিখারা এদের জন্য কিছু খাবার এনেছিল। সেগুলো উপজাতি প্রধানের কাছে দেওয়া হল। পরস্পরকে সম্ভাষণ করার কায়দাটাও অদ্ভুত। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে তারপর মিগুয়েল কারুর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। অনিলিখা, ফার্নান্ডো, রিকার্ডো-ও তাই করতে লাগল।

সম্ভাষণ পর্ব সমাপ্ত হলে ওরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু পথ ধরে এগোতে লাগল। জঙ্গলের নীচের দিকটা অদ্ভুতরকমের পরিষ্কার। সূর্যের আলোর অভাবে কোনও ছোট গাছ-গাছালি জন্মায়নি। শুধু পচা পাতা, গাছের ফল পড়ে আছে। ওপরের দিকে তাকালে গাছের মাথা খুঁজে পাওয়া যায় না। এককেটা গাছ দেড়শো ফুটের মতো লম্বা। গাছ বেয়ে অজস্র লতাপাতা ওপরের দিকে উঠে গেছে।

খানিক হেঁটে ওরা উপজাতিদের গ্রামে প্রবেশ করল। খড়ের চালের মাটির ঘর। কিন্তু ঘরগুলো অনেক বড়। এককে ঘরে পনেরো-কুড়ি জন থাকে। উপজাতি প্রধানের বাড়ি গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে। সেখানেই গিয়ে উঠল ওরা। মিগুয়েল উপজাতি প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

উপজাতি প্রধানের ঘরে জাগুয়ারের ছাল। একটা বিশাল বড় পাত্রে শস্য রাখা আছে। ইন্ডিয়ানরা পরের দিনের কথা বেশি ভাবে না। তবু যা শস্য বাড়তি হয় তা প্রধানের বাড়িতে রেখে আসে, যাতে দরকারে তা আবার বন্টন করে দেওয়া যায়।

খানিকবাদে খাওয়ার ডাক পড়ল। কলাপাতায় করে পোড়ানো পাখির মাংস।

অনেক ইন্ডিয়ান উপজাতিরা একে অন্যের গ্রাম আক্রমণ করে মূলত অন্য গ্রাম থেকে বিয়ের পাত্রী জোগাড়ের জন্য। এরা তাই বাইরের লোকেদের সঙ্গে

মেলামেশা বেশি পছন্দ করে না।

খাওয়ার পর মিগুয়েল অনিলিখাদের ডাকলেন। তাঁর সঙ্গে প্রধানের বিস্তৃত কথা হয়েছে। প্রধান অনুরোধ করেছে রাতটা ওদের সঙ্গে কাটাতে। নাচ-গান হবে। প্রধান নাকি এ-ও জানিয়েছে যে গ্রামের অনেককে ভূতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দু-একজনকে ফেরতও পাঠাচ্ছে। কিন্তু ফেরার পর থেকে তাদের মাথার ঠিক নেই। তা ছাড়া ওদের গ্রামে অপদেবতারা নাকি নতুন-নতুন প্রাণী পাঠাচ্ছেন যাদের ওরা আগে কখনও দেখেনি। প্রধানই নাকি এরকম চারপেয়ে একটা প্রাণী দেখেছে। সবমিলিয়ে রহস্য কিন্তু একটা আছেই।

৷৷ 21 মে, ভোর পাঁচটা, মনু রিজার্ভ ফরেস্ট ৷৷

হ্যামকে শুয়ে ছিল অনিলিখা। দুটো গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝোলানো বিছানা। খোলা আকাশের নীচে। এ এক অপার্থিব অভিজ্ঞতা। জঙ্গল কখনও নিঃশব্দ হয় না। সারারাত ধরে নানান ধরনের ডাক। তারপরে গরম, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। কখনওই গভীর ঘুম হয়নি। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ দড়ির বিছানা ছেড়ে অনিলিখা উঠে পড়ল। সূর্যের আলোর ছোঁয়ায় রক্তাভ হয়ে উঠেছে পুবের আকাশ।

হাত-মুখ ধুয়ে একটু হাঁটতে বেরোল অনিলিখা। মিনিটদুয়েক হাঁটার পর রিকার্ডোর সঙ্গে দেখা। ওর সঙ্গে একটা আদিবাসী লোক আর বছরতিনেকের একটা বাচ্চা ছেলে। ওরা শিকার করতে যাচ্ছে। অনিলিখাও ওদের সঙ্গী হয়ে গেল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। কাঠবেড়ালির মতো দেখতে কিন্তু আকারে তার থেকে বড় একটা প্রাণী ব্রাজিল নাটের বাইরের খোলসটা দৃপ্ত ভঙ্গিতে ভাঙার চেষ্টা করছে।

রিকার্ডো বলে ওঠে,—অ্যাগুটি! একমাত্র এরাই ব্রাজিল নাটের খোলা দাঁত দিয়ে ভাঙতে পারে। এখানে চারদিকে ব্রাজিল নাটের গাছ। বাদাম পড়ার আওয়াজ পেলেই এরা এসে জড়ো হয়। তারপর খোলা ভেঙে বাদাম বার করে খায়।

ম্যাকারি বাঁদরের একটা দল উঁচু গাছের একডাল থেকে আরেক ডাল লাফ দিয়ে-দিয়ে যাচ্ছে। পিঠটা লাল। মুখ আর সামনের দিকটা কালো। অনিলিখার কৌতূহলী চাহনি দেখে রিকার্ডো বলে উঠল,—এরা লাল কচ্ছপের ডিম বালি থেকে বার করে খেতে ভালোবাসে। খুব বুদ্ধি। সহজেই পোষ মানে। আমাজনের জঙ্গলের একদম ওপরের দিকের ক্যানোপি অংশের বাসিন্দাদের অনেককেই আমরা

আজও জানি না। ওই স্তরে সবথেকে বেশি প্রাণীর বাস। কিন্তু একশো-দেড়শো ফুট ওপরে উঠে দেখা সম্ভব হয় না। যাদেরকে খানিকটা চিনি, তাদের মধ্যে এই ম্যাকারি বাঁদর।

আদিবাসী লোকটার হাতে একটা বাঁশের নল। ওর মধ্যে 'কুরারি' বিষ মাখানো তীর আছে। ভালো শিকারের সন্ধান পেলে ফুঁ দিয়ে তীর ছুড়বে। গাছের ওপর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে নিঃশব্দে হাঁটছে। কখন শিকার মেলে!

কুচকুচে কালো রঙের একদল হাউলার বাঁদর গাছের উপরে বসে আছে। কাল সারারাত এদের চিৎকার শোনা গেছে। সারাক্ষণ গোলাপি চোয়াল ফুলিয়ে আওয়াজ করে নিজেদের এলাকা চিহ্নিত করে। 'আমি আছি—খবরদার এসো না' গোছের। খোলা বোতলের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে যেমন আওয়াজ হয়, ওদের ডাকটা অনেকটা সেরকম।

ইতিমধ্যে ঝুপ করে একটা পাখি পড়ার আওয়াজ। আদিবাসী লোকটা একটা টাউকান পাখিকে লক্ষ্য করে বিষতীর ছুড়ে মেরেছে। বেশ বড় চেহারার পাখি। তবু এক তীরেই ঘায়েল। গায়ের রং কালো। ঠোঁটটা তিনরঙা, সবুজ, হলুদ আর লাল। প্রায় সব উপজাতি বিষতীর ব্যবহার করে। তবে প্রত্যেকের এই কুরারি বিষ তৈরির পদ্ধতি আলাদা। রিকার্ডো অনিলিখাকে সেটা বোঝাতে-বোঝাতে নদীর দিকে এগোতে থাকল।

জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে অবশ্য গায়ে জোরে ছাট লাগে না। শুধু অদ্ভুত মোহময়ী একটা টুপটাপ আওয়াজ আর ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ। আস্তে-আস্তে পায়ের কাছের জলটা বাড়ছে। আর কুড়ি-তিরিশফুট এগোলেই মনে হয় কোমর পর্যন্ত উঠে আসবে। কম জলের মধ্যে আদিবাসীটা কী যেন খুঁজছে। রিকার্ডো হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল,—সাবধান, ওই দ্যাখো কোরাল সাপ! খুব বিষাক্ত। লাল কালো ডোরাকাটা। জলের তলায় সামান্য দূরে শুয়ে আছে। ওরা সাবধানে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

খানিকটা এগোনোর পর আদিবাসীটা হঠাৎ জলের তলায় হাত ঢুকিয়ে একটা অদ্ভুত দেখতে ব্যাঙ তুলে আনল। সাত-আট ইঞ্চি হবে।

আদিবাসীর হাত থেকে ব্যাঙটা নিয়ে ডান হাতের চেটোর ওপর রেখে রিকার্ডো বলল,—কিছুদিন আগেই পঞ্চাশ-ষাটটা ব্যাঙাচি বেরিয়েছে এর গা থেকে। অনিলিখা, ব্যাঙটার পিঠটা লক্ষ করো। গর্ত, গর্ত—খোবলানো মতো পিঠটা। এই ব্যাঙের নাম পিপাটোড। এই ব্যাঙটা সায়েন্স ফিকশনকেও হার মানায়। এর পিঠের মধ্যে ডিম ফুটে ব্যাঙাচি হয়। একসঙ্গে একশোর মতো ব্যাঙাচি এর পিঠ চিরে বেরিয়ে আসে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। অবিশ্বাস্য দৃশ্য। পিঠের চামড়া ভেদ করে পটপট করে এক-একটা গর্ত দিয়ে এক-একটা ব্যাঙাচি বেরিয়ে আসছে। এরা

জলের তলায় থাকে। খয়েরি রঙের জন্য মাটি থেকে আলাদা করা যায় না। খায়ও অদ্ভুতভাবে। ভ্যাকুম তৈরি করে জলের সঙ্গে ছোট-ছোট মাছ টেনে নেয়। আমার তো মনে হয় এটা অন্য গ্রহের জীব।

অনিলিখা বলে উঠল,—আমাদের মধ্যেই কি অ্যালিয়েনরা আছে? হয়তো অন্য গ্রহ থেকে এসে যুগযুগ ধরে পৃথিবীতেই আছে, কে জানে!

হঠাৎ হাউলার বাঁদরগুলো সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। বেশ জোরে ডাকতে শুরু করল।

রিকার্ডো বলে উঠল,—অনেক সময় জাগুয়ার, অ্যানাকোন্ডা বা বড় কোনও জন্তু দেখলে এরা এরকম চিৎকার করে। আমাদের একটু সাবধান হতে হবে।

আদিবাসী লোকটা আর বাচ্চা ছেলেটা ভয় না পেয়ে জলের মধ্যে হেঁটে-হেঁটে মাছ ধরতে লাগল। বিষতীর ছোঁড়ার পাইপটা ছেলেটার হাতে দিয়ে লোকটা এখন ডান হাতে বর্শা নিয়েছে। বর্শা বিঁধিয়ে মাছ ধরে বাঁ-হাতে রাখা কাঠের বাক্সে ফেলছে। যা দক্ষতার সঙ্গে মাছ গাঁথছে, তা রীতিমতো দেখার।

অনিলিখা আর রিকার্ডো সাবধানে এগোতে থাকল। হাউলারগুলোর ডাক আরও বেড়ে গেছে। একটা শ্লথ খুব ধীরগতিতে পাম গাছের গুঁড়ি নখ দিয়ে আঁকড়ে ওপরের দিকে উঠছে। কোনও ব্যস্ততা নেই।

হঠাৎ চারদিকের এই থমকে থাকা পরিবেশটা বদলে গেল। পাশের কয়েকটা গাছ সরিয়ে যে জীবটা বেরিয়ে এল সেরকম কোনও আজব চেহারার জীব আগে কখনও দেখেনি ওরা। প্রায় আট ফুটের মতো উঁচু। লালচে খয়েরি রং। পেছনের পা দুটো ছোট। তুলনায় সামনের পা দুটো অনেক বড়। চারটে পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে। ঘোড়ার মতো মুখ, জিরাফের মতো লম্বা গলা। গরিলার মতো পেশিবহুল চেহারা। পায়ের পাতায় তিনটে করে আঙুল।

দুজনের মুখেই খানিকক্ষণ কথা নেই। রিকার্ডোই নীরবতা ভেঙে বলে উঠল,—ক্যালিকোথিয়ার্স। মিয়োসিন যুগের জীব। বহুদিন আগে উধাও হয়ে গেছে। আশ্চর্য! এখানে কী করে এল? নিরামিষাশী বলে ধারণা করা হয়। অবিশ্বাস্য ব্যাপার! 12000 বছর আগে শেষ তুষার যুগের সময় এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বলে ধারণা। জানতামই না যে এখনও এদের কোনও অস্তিত্ব আছে।

আদিবাসী লোকটা এতক্ষণে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেয়েছে। ভয় পাওয়া দূরের কথা। বর্শা হাতে তেড়ে গেল জন্তুটার দিকে। জন্তুটাও বিকট আওয়াজ করে মুখ ঘুরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

রিকার্ডো অনিলিখার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলে ওঠে,—প্রধান তাহ্লে ভুল বলেনি।

॥ অ্যাশানিন্কা উপজাতি এলাকা, মনু ফরেস্ট, পেরু, 10 জুন, রাত দশটা ॥

অর্ধনিমগ্ন গাছের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে আমাজনের এই্ শাখা নদী। বর্ষার আমাজন এত চওড়া যে একদিক থেকে আরেকদিক দেখা যায় না। চাঁদের আলোয় মায়াবী পরিবেশ! কিছু-কিছু জায়গায় জলে ভালো স্রোতও আছে। একটা টটোরা নৌকোয় রিকার্ডো আর অনিলিখা। অন্য আরেকটা নৌকোয় অ্যাশানিন্কা উপজাতির এক আদিবাসী। বাঁশের তৈরি ছোট এই্ নৌকো এরা একাই্ কাঁধে বয়ে নিয়ে যায়।

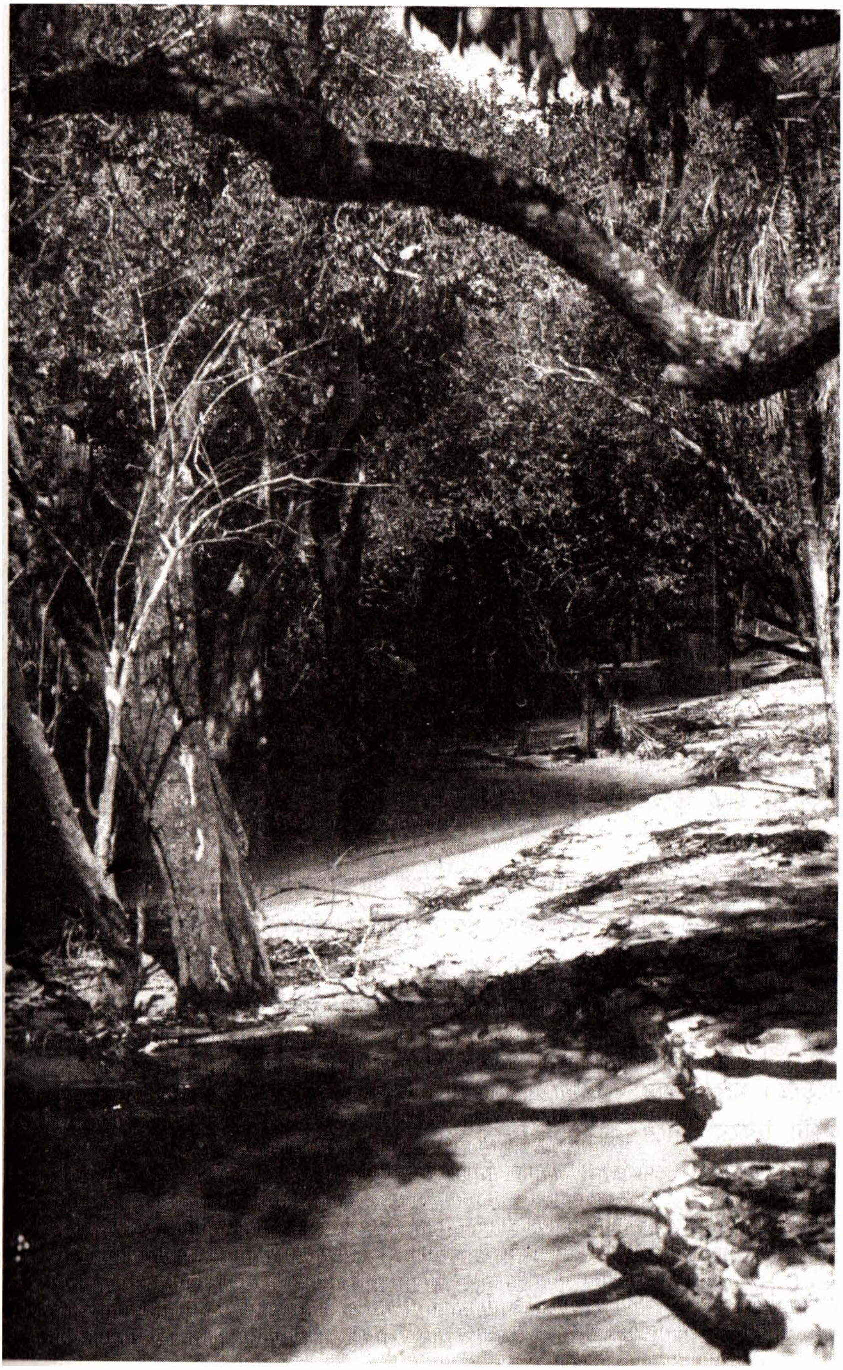
অ্যাশানিন্কারা অপেক্ষাকৃত উন্নত। এদের প্রধান বাসভূমি অ্যান্দেজ পাহাড়ের পূর্বদিকে আমাজন বেসিনে—নদীর উৎসমুখে। ইনকারা, স্প্যানিশরা কেউ কোনওদিন এদেরকে অধীনে আনতে পারেনি।

গত কয়েকদিনে অনিলিখারা বেশ কিছু উপজাতি এলাকায় গেছে। বোরা, ইয়াগুয়া, ওরেজোন, আয়মারা, অ্যাগুয়ারুনা, অ্যামাহুয়াকা, অ্যান্ডোয়া, শিউয়ার, শিপিকো, সিকুয়ানি। প্রত্যেক উপজাতির রীতিনীতির মধ্যে অনেক মিল থাকলেও অনেকক্ষেত্রে এদের আচার ব্যবহার একেবারেই আলাদা। এই্ পৃথিবীর মধ্যেই্ যে এত বিচ্ছিন্ন এত অন্যধরনের মানবজাতি থাকতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

অনিলিখারা এদের একাধিক প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছে। অনেকক্ষেত্রে উপজাতিদের সঙ্গে রাতও কাটিয়েছে। এই্ আঠারো দিনের অভিজ্ঞতা লিখতে গেলে একটা বই্ হয়ে যাবে।

তবে যে-ক'টা সিদ্ধান্তে আসা গেছে তা হ্ল,—এক, প্রত্যেক উপজাতিরই্ লোকসংখ্যা গত দু-বছরে দশ শতাংশ বা তার বেশি কমে গেছে। দুই্, এদের মধ্যে অনেকেই্ কয়েক মাসের মতো হারিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। এরা সবাই্ পুরুষ। ফিরে আসার পর এদের সবার মধ্যে বড় পরিবর্তন দেখা গেছে। এদের সবার স্মৃতি বিলুপ্ত হয়েছে, নতুন কিছুও মনে রাখতে পারে না। কোনও কিছুতে ভয় একেবারে চলে গেছে। তিন, এ এলাকার জঙ্গলে নতুন-নতুন প্রাণী দেখা যাচ্ছে, যা আগে বহু বছর কখনও দেখা যায়নি।

ক্যালিকোথিয়ার্স ছাড়াও আরেকটা অজানা প্রাণী অনিলিখা নিজের চোখে দেখেছে। প্রায় দেড়শো বছর আগে বিলুপ্ত হয় কোয়াগ্যা। জেব্রার মতো অনেকটা



দেখতে এই প্রাণী 1878 সালের পর আর দেখা যায়নি। মাংস আর চামড়ার লোভে কোয়াগ্যাদের মেরে ফেলা হত। এই বিলুপ্ত প্রাণীরই দেখা মিলল বোরা উপজাতির সঙ্গে দেখা করার সময়। ওরা একটা কোয়াগ্যাকে ধরে পোষ মানানোর চেষ্টা করছে। একমাস আগে বন থেকে ধরে এনেছে।

বেশিরভাগ উপজাতির লোকই হারিয়ে যায় রাতের সময়—মাছ ধরতে গিয়ে। তাই অনিলিখারাও মাঝেমধ্যে রাতের শিকারের সঙ্গী হয়। যদি অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে! আজ রাতে সেই উদ্দেশ্যেই ওরা বেরিয়েছে। সামনের বোটে অ্যাশানিন্‌কা উপজাতির লোকটা গাছের ছাল দিয়ে তৈরি একটা পোশাক পরে দাঁড় বাইছে। মাঝেমধ্যে ছোট জাল ফেলে মাছ ধরছে। খানিক আগে একটা তিন কেজি মতো ওজনের বড় ট্যাকুনারে মাছ ধরে খুব খুশি। ট্যাকুনারে ভারি সুস্বাদু মাছ। হালকা সবুজ রঙের। একটা ট্যাকুনারেতে রীতিমতো ভোজ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে সামনের বোটের জালে এক ঝাঁক পিরান্‌হা ধরা পড়েছে। পিরান্‌হার ঝাঁক কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যে-কোনও বড় প্রাণীর মাংস খেয়ে নিতে পারে। তবে এরা মূলত মরা প্রাণীরই মাংস খায়। মানুষকে সাধারণত আক্রমণ করে না। বরং মানুষই এদেরকে মেরে নানারকম সুস্বাদু আইটেম রান্না করে।

হঠাৎ খানিকটা দূরে খুব জোরে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ শুরু হল। রিকার্ডো অনিলিখা দাঁড় বেয়ে ওদিকে এগোতে থাকল। একটা গাছের তলায় অল্প জলে কুমির আর অ্যানাকোন্ডার মধ্যে সাংঘাতিক মারামারি হচ্ছে। আরেকটু এগিয়েই রিকার্ডো হাত তুলে অনিলিখাকে দাঁড় বাইতে বারণ করল। শুধু বলে উঠল,—অবিশ্বাস্য!

চাঁদের অকৃপণ আলোয় চারদিক দেখা যাচ্ছে। তাই হাতচল্লিশেক দূর থেকেও অনিলিখা বুঝতে পারল রিকার্ডোর বলার কারণ। কুমিরটা অস্বাভাবিক বড়। আর চোখটা যে-কোনওদিকে ঘোরাতে পারে। প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা বিশাল চেহারার অ্যানাকোন্ডাটা কুমিরের চোয়ালের কামড়ে ছটফট করছে। লেজ দিয়ে পাশের একটা গাছ জাপটে ধরে পালানোর চেষ্টা করছে। বিশাল গাছটা সাপের টানে ঝুঁকে পড়েছে। মারামারিটা দু-মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। দ্বিখণ্ডিত অ্যানাকোন্ডার একটা টুকরো নিয়ে কুমিরটা ফিরে আসছে।

রিকার্ডো অনিলিখা বোট নিয়ে জোরে দাঁড় বেয়ে দূরে যেতে থাকল। প্রাণপণে দাঁড় বাইতে-বাইতে রিকার্ডো বলে উঠল,—আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। এটা হল সারকোসুক্‌আস কুমির। ক্রেটেসাস যুগে এ ধরনের কুমির ছিল। টিরেক্সও এদের ভয় পেত। সাংঘাতিক হিংস্র আর গায়ে খুব জোর। গত কয়েক হাজার বছরে এরকম কুমির দেখা যায়নি। কী হচ্ছে আমি কিছুই

বুঝতে পারছি না।

—আচ্ছা, ওই লোকটা কোথায় গেল! ওর বোটটা দেখছি না তো। অনিলিখা বলল।

—ওই-ওই তো ওর বোটটা। গাছের ধারে। কিন্তু লোকটা কোথায়? চলো তাড়াতাড়ি দেখা যাক। কুমিরটার পেটে গেল না তো!

হঠাৎ রিকার্ডো উহ্ করে উঠল। কী হল বোঝার আগেই অনিলিখার পিঠেও একটা তীর এসে বিঁধল। মুহূর্তে চন্দ্রালোকিত নদীতীরে যেন আঁধার নেমে এল।

॥ মনু জঙ্গল, আমাজন, পেরু, 11 জুন ॥

ঘুম ভাঙার পর অনিলিখা খানিকক্ষণ কিছুই মনে করতে পারল না। তারপর আস্তে-আস্তে মনে পড়ল। বোট, অস্বাভাবিক বড় একটা কুমির আর অ্যানাকোন্ডার লড়াই। তারপরে পিঠে কী যেন একটা বিঁধল। পিঠে অসহ্য ব্যথা এখনও। উঠে বসতে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকটা একবার দেখে নিল। কাঠের ঘর। গোলাকৃতি। ঘরের মধ্যে একটাই খাট। যার ওপর অনিলিখা শুয়ে আছে। কোণের দিকে একটা মাটির পাত্র। খুব সম্ভবত জল রাখার। মাথার কাছে দেওয়ালে একটা আলো লাগানো। কোনও পাখার ব্যবস্থা নেই। জানলাও নেই। ভেতরটা তাই গুমোট মতো। কতক্ষণ এরকম শুয়ে আছে কে জানে! একটু খেয়াল করতেই চোখে পড়ল ঘরের মধ্যে দুটো ক্যামেরা। কেউ নিশ্চয়ই লক্ষ রাখছে অনিলিখার ওপর। কুণ্ঠিত হয়ে শুয়ে-শুয়েই পোশাক ঠিক করে নিল। খানিকবাদে মনের সমস্ত জোর একত্র করে উঠে বসল। শুধু পিঠের ব্যথাই নয়, কীরকম যেন নেশার ঘোরে মাথাটা ঘুরছে। তীরে নিশ্চয়ই বিষ মেশান ছিল।

কুরারি বিষ বিভিন্ন ভাবে বানানো যায়। এখন বেশ কিছু ওষুধ কোম্পানি কুরারি বিষের কিছু উপাদান কাজে লাগিয়ে মাস্‌ল রিল্যাক্সেশনের ওষুধ তৈরি করছে।

মিনিটপাঁচেক পরে খাট থেকে উঠে দাঁড়াতে পারল অনিলিখা। দরজাটা শুধু ভেতর থেকে ভেজানো আছে। খুলে অবাক হল। বাইরেও কেউ পাহারায় নেই। পর মুহূর্তেই অবশ্য বুঝতে পারল কেন পাহারায় নেই! ঘরটা একটা বাঁশের মাচার ওপরে। সামনে ছোট খোলা বারান্দা। নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আমাজন নদী। ঘরে ঢুকতে-বেরোতে গেলে নৌকো লাগবে। নৌকোতে নামা ওঠার জন্য একটা ভাঁজ-করা মই বারান্দার সঙ্গে লাগানো আছে। কিন্তু কোনও নৌকো নেই। অবশ্য ঝাঁপ দিয়ে নদীতে নামা যায়। খানিকটা সাঁতার কাটলেই কোনও-না-কোনও গাছে

উঠে পড়া যাবে। কিন্তু মাঝের নদী নিশ্চয়ই নিরাপদ নয়। খানিক দূরে জলের মধ্যে কুমির চোখে পড়ল। তবে সাধারণ কুমির। সেদিনের কুমিরটার মতো অস্বাভাবিক বড় নয়। কিন্তু অনিলিখাকে খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আর এটুকু পথ পেরোলেই তো হল না। চারদিকে গভীর জঙ্গল। এরকম জঙ্গল থেকে বেরোনো প্রায় অসম্ভব।

হঠাৎ বেশ জোরে বজ্রপাতসহ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আমাজনে এরকম হঠাৎ-হঠাৎ বৃষ্টি নামে। এমনিতেই সন্ধে হয়ে এসেছিল। বর্ষার কালো মেঘ অন্ধকার আরও বাড়িয়ে তুলেছে। মাঝে-মাঝে জঙ্গলের ওপর চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে বিদ্যুতের আলো।

এরমধ্যেই দূর থেকে একটা বোট আসতে দেখল অনিলিখা। এদিকেই আসছে। মোটরবোট। ওপরটা চাদরে ঢাকা। অতিথিরা যে তাকেই দেখতে আসছে তা বুঝতে পেরে অনিলিখা দরজা বন্ধ করে খাটের ওপর এসে বসল।

খানিকবাদে দরজায় নক্ করে দুজন ঘরে এসে ঢুকল। একজন বৃদ্ধ—স্যুট-টাই পরা। দেখেই ব্রিটিশ বলে মনে হয়। অন্যজন আদিবাসী। হলুদ হাফপ্যান্ট পরা। গায়ে লাল-হলুদ-গোলাপি ডোরাকাটা চাদর। মাথায় রঙবেরঙের টুপি। দেখেই বোঝা যায় কানোয়ারা উপজাতির লোক। এরা একসঙ্গে এখানে কী করছে?

বৃদ্ধ বিশুদ্ধ ব্রিটিশ ইংরেজিতে বলতে শুরু করলেন,—এভাবে এখানে ধরে নিয়ে আসতে হল, তার জন্য দুঃখিত। আগেই সাবধান করেছিলাম। দেখলে রবার্তো গুলি খেল। তুমি একটুর জন্য মরতে-মরতে বেঁচে গেলে। তোমরা কখন কোথায় যাচ্ছ সবই আমার জানা ছিল। ভেবেছিলাম ভয় পেয়ে ফিরে যাবে। তা সত্ত্বেও এত আগ্রহ যখন রহস্য উদঘাটনের, তখন একটু ফলভোগ তো করতেই হবে। বাইরে তাকিয়েই নিশ্চয় বুঝেছ এখান থেকে পালানো অসম্ভব। একসঙ্গে এত হিংস্র প্রাণী পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

—রিকার্ডো কোথায়?

ওপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বৃদ্ধ বলে উঠলেন,—ঘণ্টাদুয়েক আগে পালানোর চেষ্টা করেছিল। আমাদের বারণ সত্ত্বেও। ফল যা হওয়ার হয়েছে, ওর দেহ আমরা দশ মিনিট আগে উদ্ধার করেছি। খুব সম্ভবত জাগুয়ারের আক্রমণে মারা গেছে। জাগুয়ার অবশ্য এখানকার নিরীহ প্রাণীদের মধ্যে পড়ে।

একটু থেমে বৃদ্ধ আবার বললেন,—তোমার কাছে দুটো পথ খোলা আছে অনিলিখা। এক আমার হয়ে কাজ করা। তোমার মতো ট্যালেন্টেড বিজ্ঞানীদের আমার খুব দরকার। দুই, মৃত্যু। অন্য কোনও উপায় নেই। এ-এলাকা পাহাড়, ঘন জঙ্গল, ঘন মেঘের জন্য স্যাটেলাইটের কাছেও অধরা। এখান থেকে পালানো বড় শিকারির পক্ষেও অসম্ভব। তা তুমিই তোমার পথ ঠিক করে নাও। সময়

নাও। ক্যাটুন্টা তোমার জন্য টার্কির পোড়া মাংস নিয়ে এসেছে। খেয়ে নাও। কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

বলে বৃদ্ধ ঘরের দেওয়ালে একটা স্পিকারের দিকে নির্দেশ করলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যাটুন্টাকে অজানা ভাষায় কী একটা বললেন। ক্যাটুন্টা ঘরের কোণে কলাপাতার ওপর খাবারটা রেখে দিল। দুজনে ঘর থেকে বেরোতে যাবে, এমনসময় অনিলিখা বলে উঠল,—ডক্টর গিল!

বৃদ্ধ চমকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

—আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি ডক্টর গিল। শুধু এটা বুঝতে পারছি না, আপনার মতো বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সারা পৃথিবী থেকে লুকিয়ে এখানে কী করছেন! আপনিই বোধহয় প্রথম বুঝতে পারেন যে ক্রপ সার্কেল অন্য গ্রহের জীবেদের তৈরি। তারা বিশেষ কোনও বার্তা পৃথিবীর মানুষকে জানানোর জন্য রেখে গেছে। আপনি ওই সংকেত উদ্ধারও করেন। তারপরে টাকার লোভে, আরও ক্ষমতার লোভে আপনি চেষ্টা করেন কীভাবে ক্রপ সার্কেল অন্য বিজ্ঞানীদের নজর থেকে লুকিয়ে রাখা যায়। আপনি তাই প্লাজমা ভর্টেক্স থিয়োরির কথা বলেন—এটা বোঝানোর জন্য যে, এগুলো সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিজ্ঞানীরাও মেনে নেয় যে ক্রপ সার্কেলে অ্যালিয়েনদের কোনও হাত নেই। আপনার জবাব নেই, সারা পৃথিবীকে আপনি বোকা বানিয়েছেন! যাতে আপনি যা জানেন, অন্যরা তা না জানতে পারে।

—অসাধারণ অনিলিখা! আমি তোমার প্রতিভার কথা আগেই শুনেছি। বরফের মধ্যে আটকে থাকা বাতাসে অক্সিজেন আইসোটোপের মিশ্রণ দেখে কীভাবে অতীতের তাপমাত্রা বোঝা যেতে পারে—তোমার ওই রিসার্চ পেপারটা আমি পড়েছিলাম। তখন থেকেই তোমার সম্বন্ধে আমার খুব উঁচু ধারণা। তোমাকে আমার দলে পেলে আমি আমার কাজ আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।

তবে তুমি একটা জায়গায় ভুল বলেছ। বেশ কিছু ক্রপ সার্কেলের মধ্যে যে অ্যালিয়েনদের তৈরি করা জটিল সংকেত লুকিয়ে আছে—আমি প্রথমে সেটাই বলতে চেয়েছিলাম। কেম্ব্রিজে এক কনফারেন্সে বলেওছিলাম। কিন্তু তা নিয়ে এমন হাসাহাসি, আমার নামে এমন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেল যে, তখনই বুঝলাম আমি আমার সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে আছি। যা বলছি তা কেউ সহজে বিশ্বাস করবে না। যা করার আমাকে একাই করতে হবে। সরকার থেকে আমার রিসার্চের জন্য কোনও ফান্ড তো পেলামই না, উলটে কেম্ব্রিজ আমাকে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান পদ থেকে সরিয়ে দিল। আমি তখন প্লাজমা ভর্টেক্স থিয়োরির মাধ্যমে সবাইকে ক্রপ সার্কেল তৈরির রহস্য বুঝিয়ে দিলাম। ওটা তো এখন অনেক

ইউনিভার্সিটিতে পড়ানোও হয়। কত তফাত! বিজ্ঞান সবসময় প্রমাণিত তথ্য চায়। অ্যালিয়েন প্রমাণিত নয়। তাই ওদের নিয়ে কথাও বলা বারণ।

—তবে আপনি বোধহয় তখনই সংকেত উদ্ধার করতে পারেননি। পারেন 1995 সালে। তার পরেই আপনি হারিয়ে যান। কিন্তু কী ছিল আপনার উদ্ধার করা এই সংকেতে, যার জন্য আপনাকে সারা বিশ্বের থেকে লুকিয়ে কাজ করতে হবে! আসতে হবে আমাজনের দুর্গমতম এলাকায়?

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ কী খেয়াল হতে অনিলিখা ফের উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল,—ও মাই গড! এখন বুঝতে পারছি এ এলাকায় কেন অতীতের বিলুপ্ত প্রাণী পাওয়া যাচ্ছে। এটাই আপনার গবেষণা। জুরাসিক পার্কের মতো একটা পার্ক তৈরি করা, যাতে থাকবে অতীতের হারানো প্রাণী। ক্রপ সার্কেলের সংকেত উদ্ধার করেই আপনি এই পদ্ধতির কথা জানতে পারেন। চলে আসেন পৃথিবীর এমন এক প্রত্যন্ত জঙ্গল প্রান্তে যার হদিস কেউ চট করে পাবে না। আপনার তৈরি প্রাণীরা তাদের বাঁচার মতো পরিবেশও পাবে।

ড. গিলের চোখ চকচক করে উঠল। এগিয়ে এসে অনিলিখার হাত ধরে করমর্দন করে বলে উঠলেন,—ওয়েলকাম টু মাই টিম। আমার টিমে এখন পর্যন্ত বিশ্বের সেরা বত্রিশজন বিজ্ঞানী আছেন। তোমাকে পেলে তা আরও শক্তিশালী হবে। শুধু একটা জিনিস বলি। আমি কখনওই টাকা বা ক্ষমতার লোভে কিছু করিনি। পার্ক বানাবার কোনও উদ্দেশ্যও আমার নেই। আমার বাবা ছিলেন ইংল্যান্ডের সবথেকে ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন। আমার জন্য যা সম্পত্তি রেখে গেছেন, তা থেকেই আমি গবেষণার পিছনে খরচ করেছি। কোনও লাভের আশায় নয়। শুধু আবিষ্কারের আনন্দের জন্য। যেসব প্রাণীকে মানুষ কখনও দেখেনি, শুধু ফসিল দেখে কল্পনা করেছে—তাদের আবার রক্তমাংসের চেহারা দেওয়ার জন্য। আমি এখানে তিরিশটা প্রজাতির প্রাণী তৈরি করেছি, যারা গত একশো থেকে দশ লক্ষ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

—আমি জানি না, আপনি কী আলাদা পদ্ধতির কথা জেনেছেন। আজকে এমনিতেও তো আমরা জিন রিসার্চে অনেক অগ্রগতি করেছি। গত একশো-দেড়শো বছরে যেসব প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের ক্লোন করে তৈরির চেষ্টা করছি। হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে তাসমানিয়ার বাঘও ভূমিষ্ঠ হবে।

—তাতে কি ক্যালিকোথিয়ার্‌সকে ফিরিয়ে আনা যাবে, যা বারো হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে? না বানানো যাবে টারওহ্‌সোর-এর মতো উড়ন্ত সরীসৃপ যা কয়েক লক্ষ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে?

অবাক হয়ে অনিলিখা বলে,—আপনি কি টারওহ্‌সোর-এর মতো হিংস্র উড়ন্ত সরীসৃপও ফিরিয়ে এনেছেন?

—হ্যাঁ, এখানে চারটে টারওহ্সোর আছে। ওর মতো হিংস্র আরও জুরাসিক আর ক্রেটেসিয়াস যুগের প্রাণীও আছে। তবে সবই আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ঠিক তোমার মতো।

—মানে? আপনি কি ওদের নিয়ন্ত্রণ করেন নাকি?

—যে-কোনও জন্তু কখন কতটা আক্রমণাত্মক হবে বা কখন শান্ত থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ করে ব্রেনের একটা অংশ। এখানে আমরা যত প্রাণী সৃষ্টি করেছি, সবার ব্রেনের মধ্যে একটা ছোট রেডিও কন্ট্রোলড ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে দিয়েছি। ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ওই ইলেকট্রোড চালু বা বন্ধ করে আমরাই ঠিক করি ওই জন্তু কখন কাউকে আক্রমণ করবে। কখন ঘুমিয়ে থাকবে। 1960 সালে বিজ্ঞানী হোসে ডেলগ্যাডো এভাবে ষাঁড়কে কন্ট্রোল করে দেখিয়েছিলেন। আমাদের প্রযুক্তি অবশ্য আরও উন্নত মানের। আমরা এখানে কম্পিউটারের কি-বোর্ডে টাইপ করে কোন প্রাণী কতদূর যাবে তাও নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এই যে বোরা উপজাতির লোকেরা কোয়াগ্যা ধরেছে, তা আমরাই ওদের হাতে তুলে দিয়েছি। আমরা দেখতে চাই কোয়াগ্যা গৃহপালিত পশু হিসেবে কীরকম থাকে।

—ডক্টর গিল আপনি যা করেছেন তা কতটা সাংঘাতিক তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্য। এরকম সংকেত পাঠিয়ে অন্যগ্রহের জীবদের লাভটা কী?

—খুব ভালো প্রশ্ন। কিন্তু উত্তরটা আমার জানা নেই। সত্যি কথা বলতে কী একটা সংকেত উদ্ধার করেই যা পেয়েছি, তা দিয়ে সারা পৃথিবী বদলে দিতে পারি। আমি আরও দুটো ক্রপ সার্কেলের সংকেত উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারিনি। হাতে সময়ও ছিল না। এগুলো খুবই জটিল সংকেত। কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে সংকেত উদ্ধার করা যায় না। ওরাও বোধহয় সেটাই চায়। যাতে কোনও একজন মানুষ সব জেনে ক্ষমতার মিস্ইউজ না করে।

একটু থেমে ড. গিল বললেন,—সন্ধে হয়ে এসেছে, অনেক কাজ বাকি আছে। আমি চললাম। কাল সকালে আমার লোক এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। দেখবে আমাদের কর্মকাণ্ড।

হঠাৎ ড. গিল থেমে গেলেন। ঘরটা যেন দুলে উঠল।

॥ 15 জুন, সকাল আটটা, মনু ফরেস্ট, পেরু ॥

এরকম অদ্ভুত কর্মশালা অনিলিখা আগে কোনওদিন দেখেনি। ছোট-ছোট গোল কাঠের বাড়ি। প্রত্যেকটা মাচার ওপর। নীচ দিয়ে বয়ে গেছে আমাজন। আমাজন

বর্ষায় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে (দক্ষিণ গোলার্ধের নিয়মমতো) ফুলে ফেঁপে ওঠে। নভেম্বর থেকে এপ্রিলের মধ্যে জলতল কিছু-কিছু জায়গায় প্রায় 45 ফুট উঠে আসে। তাই মাচার ওপর বাড়ি সারা বছরের নিরাপদ আশ্রয়।

অনিলিখাকে বোটে করে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে প্রোজেক্টের কাজ দেখাচ্ছেন বিজ্ঞানী ন্যান্সি স্যাবাতো। বিশাল জায়গা জুড়ে কর্মকাণ্ড। ন্যান্সি ব্রেন সার্জেন। এখানে ন্যান্সি কী করছেন তা এখনও জানা হয়নি অনিলিখার।

—বাড়িগুলো একই ধরনের। এর ভেতরেই কি গবেষণা হয়? না কি এগুলো থাকার জায়গা?

—আসলে এটা আগে ছিল একটা পরিত্যক্ত উপজাতি এলাকা। হারিয়ে যাওয়া শহর এল ডোরাডোর নাম শুনেছ? গত চারশো বছর ধরে সবাই এল ডোরাডো খুঁজে বেরিয়েছে সোনার সন্ধানে। ধারণা করা হত, ওই শহরে ইনকারা অনেক সোনা লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু কেউ খুঁজে পায়নি। যারা খুঁজতে এসেছিল শহর সম্বন্ধে তাদের ধারণা ভুল ছিল। তাদের ধারণা ছিল শহর মানে বড়-বড় বাড়ি, বিশাল রাস্তাঘাট। কখনওই তারা এ ধরনের শহর কল্পনা করেনি। এ শহর স্যারই আবিষ্কার করেন। গোটা কুড়ি বাড়ি নিয়ে একটা ব্লক। মাইলখানেক দূরে আবার এরকম কিছু বাড়ি। প্রত্যেক ব্লককে যুক্ত করলে প্রায় কুড়ি মাইল ব্যাসের একটা বৃত্ত পাওয়া যাবে। প্রত্যেকটা বাড়ির ব্লক থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আগে ভালো রাস্তা ছিল—যা জল নেমে গেলে আজও দেখা যায়। বৃত্তের কেন্দ্রে বেশ বড় জায়গা। সেখানেই স্যারের বাড়ি আর আমাদের মূল রিসার্চ সেন্টার। সেখানে মাটি অনেক উঁচু, কখনও জল ওঠে না। এই বাড়িগুলো থাকার জন্যও যেমন ব্যবহার করা হয়, তেমনই কিছু-কিছু বাড়ি রিসার্চের জন্যও ব্যবহার করা হয়।

—তা তোমরা সোনাও পেয়েছ নাকি?

—তা জানি না। তবে স্যার গবেষকদের যা মাইনে দেন তা যে-কোনও ইউনিভার্সিটির গবেষকদের তুলনায় বহুগুণ বেশি। জানি না সে টাকা কোথা থেকে আসে।

মোটরবোটের পাশ দিয়ে একটা টেপির সাঁতার কেটে চলে গেল। এসময় সব প্রাণীকেই একটু সাঁতরাতে হয়। ন্যান্সি বলল,—এরকম রিসার্চের পরিবেশ সব গবেষকের কাছেই স্বপ্নের মতো। আমি গত তিনবছর কতরকম জন্তু দেখেছি তা বলে শেষ করা যাবে না। এখন ভয়ও চলে গেছে। কয়েক মাস আগে একটা ইলেকট্রিক ইলের 500 ভোল্টের শক খেয়ে প্রায় প্রাণ যেতে বসেছিল।

খানিকবাদে চারপাশের জল একটু কমে গেল। আরও মিনিটপাঁচেক বাদে বোট একটা তীরে এসে দাঁড়াল। এখানে নামলে পায়ের পাতা ডুবে যাবে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার একটা পথ ওপরের দিকে চলে গেছে। বোঝা যায়

অনেক লোকের যাতায়াত আছে এ পথে।

—এ এলাকা নিরাপদ। কোনও হিংস্র জন্তু নেই। তবে পায়ের দিকে খেয়াল রেখো। কোরাল সাপ বা স্ট্রিং-রে থাকতে পারে। স্ট্রিং-রে'র ল্যাজে মারাত্মক বিষ থাকে। পা পড়লেই বিষ ছোবল দেবে। ন্যান্সি সাবধান করে দিল।

পা টিপে-টিপে অনিলিখা ন্যান্সির পেছন-পেছন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। রাস্তা ওপরের দিকে উঠেছে। পায়ের তলায় শুধু ভিজে পাতার মচমচ আওয়াজ। মিনিটতিনেক হাঁটার পরেই অনিলিখারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বিশাল একটা খোলা মাঠের ধারে এসে পৌঁছল। মাঠের মাঝে কয়েকটা খড়ের চালের বেশ বড়-বড় মাটির বাড়ি।

—ওগুলোই আমাদের মূল রিসার্চ সেন্টার। চলো একটায় ঢোকা যাক। ন্যান্সি বলে উঠল।

মিনিটপাঁচেক হেঁটে অনিলিখারা একটা বাড়িতে ঢুকল। বাড়ি বললে ভুল হবে। ঢোকার পরেই সিঁড়ি নীচে নেমে গেছে। ওপরে শুধু গোল বারান্দায় দাঁড়ানোর জায়গা। মাটির নীচে ওপরের প্রায় দশগুণ বড় গোল এলাকা। তার এক প্রান্তে একটা অদ্ভুত জীব। ড্রাগনের মতো দেখতে। ইন্দোনেশিয়ার কমোডো ড্রাগনের থেকে লম্বায় দ্বিগুণ বড়। প্রায় বারো ফুট। কালচে রং। মাঝে-মাঝে লম্বা জিভ বার করছে। শক্ত খোলসের ওপর দিকে কাঁটা-কাঁটা। বিশাল লেজ আর নীচের দিকটা ইগুয়ানার মতো। তিনটে হাত। প্রত্যেকটা হাতে পাঁচটা আঙুল-তাতে ধারালো বড় বাঁকানো নখ। লালচে চোখ আর ড্রাগনের মতো মুখ দেখেই বোঝা যায় খুব হিংস্র হবে।

ন্যান্সি পাশ থেকে বলে উঠল,—100 মিলিয়ন বছর আগে এই ড্রাগন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আজকে যে ইগুয়ানা দেখা যায় বা ইন্দোনেশিয়ার কমোডো ড্রাগন দেখা যায়, তার পূর্বজ। আমরা আবার সৃষ্টি করেছি। এটা একটাই আছে। প্রচণ্ড হিংস্র। কিছু শুনতে পায় না। কিন্তু খুব শক্তি। শিকার কাছে এলেই ব্যস।

ড্রাগনটার উলটোদিকের প্রান্তের দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি গা, লাল হাফপ্যান্ট পরা আদিবাসী। তার দিকে নির্দেশ করে অনিলিখা বলে উঠল,—ও ওখানে কী করছে?

ন্যান্সি এবার বাঁ-দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল,—ওদের লক্ষ করেছ? চারজন কম্পিউটার টার্মিনালে বসে আছে। আমার সহকর্মী। ড্রাগনটাকে জঙ্গলে ছাড়ার আগে ওরা দেখে নিচ্ছে কম্পিউটার দিয়ে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে কি না। ওকে আমরাই শান্ত করে রেখেছি। এরা কম্যান্ড দিলেই ড্রাগনের ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট করা ইলেকট্রোড ওকে হিংস্র করে তুলবে। ও আক্রমণ করতে ছুটে যাবে লোকটার দিকে। পৌঁছনোর আগেই আবার আমরা কম্পিউটার কম্যান্ডের মাধ্যমে

ওকে থামিয়ে দেব। এভাবে আমরা ড্রাগনের সম্বন্ধেও জানতে পারব। ও কত দ্রুত, কীভাবে আক্রমণ করে তাও জানা যাবে।

—চোখে না দেখলে আমি তো ভাবতাম ড্রাগন শুধু গল্পই। এবার বুঝেছি কেন চিনে বলা হয় যে ড্রাগনের মুখ থেকে আগুন বেরোয়। যেভাবে সোনালি, বড়, কাটা জিভটা দ্রুত বার করছে আর ঢোকাচ্ছে আগুন বলে ভুল করাটা স্বাভাবিক। তা ড্রাগনটার বয়স কত? এটা কি ফুলসাইজ?

কথার উত্তর এল না। ন্যান্সি একদৃষ্টে ড্রাগনটার দিকে তাকিয়ে আছে। লেজটা সোজা করে ড্রাগনটা আদিবাসী লোকটার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে আছে। জিভটা বারবার লক্‌লক্ করে বার করছে। লোকটা ওর দিকে আস্তে-আস্তে এগোচ্ছে। হঠাৎ ড্রাগনটা তীব্র হিসহিস শব্দ করে দেহের অর্ধেকটা মাটি থেকে প্রায় পাঁচ ফুট ওপরে তুলে উঠে দাঁড়াল। তারপর লেজ ঝাপটে আর পেছনের হাতটায় ভর করে তীব্রগতিতে ছুটে চলল লোকটার দিকে। মাঝে প্রায় পঞ্চাশফুট দূরত্ব। লোকটা কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে ড্রাগনটার দিকে ধীরগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝের দূরত্ব যখন দশফুট, ড্রাগনটা মাটি ছেড়ে প্রায় উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। সামনের হাতের ধারালো নখ আর দাঁত দিয়ে পড়ে যাওয়া লোকটার শরীর আঁচড়ে কামড়ে মুহূর্তে টুকরো-টুকরো করে দিল। ন্যান্সি চেঁচিয়ে উঠেছে,—স্টপ! স্টপ ইট!

হতবাক হওয়া বিজ্ঞানীর দল উত্তেজিতভাবে কীসব টাইপ করে যাচ্ছে ল্যাপটপে। ড্রাগনটা লোকটাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মাথা তুলে হিংস্র চোখে চারদিক দেখে আস্তে-আস্তে ফিরে চলল।

ঘরে তিনজন লোক ছুটে এসে ঢুকল। আদিবাসী লোকটার রক্তাক্ত দেহটাকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় অনিলিখা এতই হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল যে, কিছু বলার আগেই ন্যান্সি পাশ থেকে বলে উঠল,—এরকম অ্যাক্সিডেন্ট খুব কমই ঘটে। ওরা কম্যান্ড দিয়ে থামানোর আগেই ড্রাগনটা ঝাঁপ দিয়েছিল। শেষে হঠাৎ যে ও উড়ে যাবে, সেটা বুঝতে পারা যায়নি।

—কিন্তু লোকটা একটুও ভয় পায়নি। এমনকী তখনও পালানোর চেষ্টা করল না। ওকে কি কোনও ওষুধ দেওয়া হয়েছে?

—আমাদের মস্তিষ্কে 'অ্যামিগ্‌ডেলা' বলে একটা অংশ আছে। এর জন্যই আমরা ভয় পাই। ধরা যাক হঠাৎ একটা বুনো ভালুক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তোমাকে ধরতে এল; তখন অ্যামিগ্‌ডেলা-ই বলে দেয় পালানো উচিত, না প্রতি আক্রমণ করা উচিত। ভয়ের অনুভূতি জাগে ওই অংশে। আমাদের কাজে যেসব উপজাতি-লোক আছে, তাদের অ্যামিগ্‌ডেলা অপারেশন করে বাদ দেওয়া



হয়েছে যাতে তারা আর ভয় না পায়। তা না হলে এসব পরীক্ষা করা যেত না।

—আর কিছু যাতে মনে না থাকে তাই মেমারিও নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাই না?

—হ্যাঁ। ব্রেনের 'হিপ্পোক্যাম্পাস'-ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। হিপ্পোক্যাম্পাস কাজ না করায় এরা কিছুই মনে রাখতে পারে না। হিপ্পোক্যাম্পাসই ঠিক করে— কোনও ঘটনাকে মনে রাখা হবে কি হবে না। এক সপ্তাহ আগে কোনদিন সকালে আমরা কী খেয়েছি তা মনে থাকে না, অথচ কুড়ি বছর আগের কোনও একটা বিশেষ দিনের কথা মনে থাকে। দরকারি তথ্য, কোনও স্মরণীয় ঘটনা হিপ্পোক্যাম্পাসই লংটার্ম মেমারিতে গুছিয়ে রাখে।

অনিলিখা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠে,—তোমরা কি মানুষ! তোমাদের জন্য আজকে ওই লোকটার প্রাণ চলে গেল! তোমাদের কাজে ব্যবহার করা অনেক আদিবাসী আজ তাদের প্রিয়জনদের চিনতে পারছে না। তাদের তোমরা ধরে আনো, আবার দরকার ফুরিয়ে গেলে ছেড়ে দাও। বাইরের লোক যাতে এ-প্রোজেক্টের কথা জানতে না পারে তার জন্য এদের মেমারি নষ্ট করে দাও। তোমরা হাজার-হাজার লোকের জীবন নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলছ!

—এ আমাদের সিদ্ধান্ত নয় অনিলিখা। এটা স্যারের আদেশ। ন্যান্সি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই পায়ের নীচের মাটি আবার গতকালের মতো জোরে দুলে উঠল। একবার নয়। পরপর তিনবার। ভূমিকম্প হচ্ছে।

॥ 16 জুন, রাত একটা, মনুর জঙ্গল, পেরু ॥

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অনিলিখার। পুরো ঘরটা দুলছে। আবার ভূমিকম্প। এই নিয়ে আজকে নয়বার ভূমিকম্প হল। খাটের ওপর উঠে বসল অনিলিখা। কবে এই বন্দিদশা কাটবে কে জানে! বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও উপায় নেই। ফোনটা ওরা নিয়ে নিয়েছে। থাকলেও এখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যেত না। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনওরকমভাবে যাতে যোগাযোগ রাখা না যায়, তার সব ব্যবস্থাই এখানে নেওয়া হয়েছে। তবে এখানকার লোকজন খারাপ নয়। ন্যান্সি ছাড়াও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তার মধ্যে ইকুয়েডরের বিজ্ঞানী ক্যাথেরিনকেও খুব ভালো লেগেছে।

ওই বলছিল ইনকাদের রাস্তার কথা। ইনকা সাম্রাজ্যের ভিত্তিই ছিল ওদের যোগাযোগ ব্যবস্থা। ইনকারা পাঁচশো বছর আগে তাদের পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে

আন্দেজ পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করেছিল। এখনকার ইকুয়েডরের কুইটো থেকে চিলির স্যান্টিয়েগো অবধি রাস্তা ছিল। বাইশ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি জায়গা জুড়ে ছিল সে রাস্তা। জায়গায়-জায়গায় সে রাস্তা গেছে ষোলো হাজারেরও বেশি উঁচু গিরিশ্রেণির ওপর দিয়ে।

'চাসকুই' দৌড়বাজরা ওই রাস্তা দিয়ে ছুটে-ছুটে রিলে সিস্টেমে এক জায়গার খবর আরেক জায়গায় পৌঁছে দিত। এক দিনে ছয়-সাতজন চাসকুই-এর হাতবদল হয়ে খবর চলে যেত আড়াইশো কিলোমিটার দূরত্ব অবধি। সে মেসেজ কোনও কাগজে লেখা থাকত না। ইনকাদের কোনও লেখার হরফই ছিল না। শুধু গিঁট বাঁধা নানান দৈর্ঘের দড়ির মধ্যে থাকত সে তথ্য। এই দড়িকে বলা হত 'কিপ্পু'। কীভাবে কিপ্পুতে এই তথ্য রাখা হত তা আজও কেউ জানে না। এই তথ্য পড়তে পারত বিশেষ কিছু লোক। তাই শত্রুপক্ষের হাতে গেলেও তারা এ-খবর পড়তে পারত না। খারাপ জরুরি খবর হলে বার্তা দুবার-তিনবার পাঠানো হত।

এভাবেই ইনকা সম্রাটের মৃত্যুর খবর পৌঁছে গিয়েছিল সেনাধ্যক্ষ রুমিনাহুই-এর কাছে। স্প্যানিশ সেনারাও বুঝতে পারেনি যে সামান্য একটা দড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকবে, এমন একটা দরকারী তথ্য—রাজার মৃত্যু সংবাদ। স্প্যানিশ সেনারা মিথ্যে বললেও 'চাসকুই'-এর হাতে দড়ি পেয়েই রুমিনাহুই বুঝেছিল তাদের সম্রাট-কে মেরে ফেলা হয়েছে। আর তার ঘাতকদের হাতে সে কি না তুলে দেবে ইনকা-দের স্বর্ণভাণ্ডার! কখনওই না! তাই রুমিনাহুই রাতারাতি 750 টন সোনা লুকিয়ে ফেলেছিল স্প্যানিশ সেনাদের হাতে না দিয়ে। শত অত্যাচারেও মুখ খোলেনি।

হঠাৎ অনিলিখার খেয়াল হল—হয়তো অন্যগ্রহের জীবেরাও এরকম কোনও বিপদের সম্ভাবনার কথা একাধিক বার জানানোর চেষ্টা করছে সংকেতের মাধ্যমে। তা না হলে ওরা একইরকম সংকেত বারবার পাঠাবে কেন? অন্য কোনও কারণে মেসেজ পাঠালে তা কি বারবার পাঠানো হত! বোধহয় নয়। তাহলে কি বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে? 'সেটি'-র সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলে বোঝা যেত ওরা গ্যালওয়ের ওই সংকেত উদ্ধার করতে পেরেছে কি না। শেষবার ওদের সঙ্গে অনিলিখার যোগাযোগ হয়েছিল পাঁচ দিন আগে। মনু লজে থাকাকালীন।

ওরা জানিয়েছিল ওরা সংকেতের সমীকরণের কয়েকটা ভ্যারিয়েবল উদ্ধার করতে পেরেছে। সেই দুটো সংখ্যা হল 12 আর 70। তবে পুরো সংকেত উদ্ধার করতে আরও মাসখানেক লেগে যাবে।

হঠাৎ অনিলিখা উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এল। বাইরে জোর বৃষ্টি হচ্ছে। ঝমঝম শব্দে জঙ্গলের সব কণ্ঠস্বর ঢাকা পড়ে

গেছে। বাতাসে কিসের যেন কড়া গন্ধ! এ-গন্ধটা অনিলিখা গত কয়েকদিনে পায়নি। সালফার-ডাই-অক্সাইড। তাহলে কি অনিলিখার ধারণাই ঠিক? এতগুলো ভূমিকম্প কি আগ্নেয়গিরিরই জেগে ওঠার পূর্বাভাস নয়! নিশ্চিত বড় কোনও আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ হতে চলেছে।

এ-এলাকার ঠিক অবস্থান বোঝা গেলে সুবিধে হত। যেখানে প্লেনে নেমেছিল, সেই বোকা মানুর অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ অনিলিখার মনে আছে। বোটের জিপিএস-এর কল্যাণে। 12^0S, 66^0W,—যেখান থেকে অনিলিখারা পশ্চিম দিকে যেতে শুরু করেছিল। ওরা কি তাহলে জানাতে চাইছে 12^0S, 70^0W। হয়তো সেটাই এখানকার অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ।

মুহূর্তে অনিলিখার কাছে সব অঙ্ক মিলে গেল। ওরা কি তাহলে এখানকার আগ্নেয়গিরির সম্বন্ধেই সাবধান করতে চাইছে? কিন্তু প্রতিবছর সারা পৃথিবীতে তো প্রায় ষাটটা আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে! তাহলে কি এটা সেগুলোর থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী? কী যেন জায়গাটার নাম? ইন্দোনেশিয়ার ট্যামবোরা। ইদানীংকালের মধ্যে সবথেকে বড় অগ্ন্যুৎপাত ওখানেই হয়েছিল। প্রায় এক লাখ লোক মারা গিয়েছিল 1991 সালে ওই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে।

অতীতেও অনেক শহর চিরকালের মতো বিলুপ্ত হয়ে গেছে আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠায়। কী যেন ছিল ওই রোমান শহরটার নাম, যা ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে পুরো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ পম্পেই। প্রায় দু-হাজার বছর আগে আগ্নেয়গিরির ছাই, লাভার স্রোতে আর বিষাক্ত গ্যাসে পম্পেইতে ষোলো হাজার লোক মারা গিয়েছিল। যে যেখানে ছিল সেভাবেই ছাইতে চাপা পড়ে গিয়েছিল। তাহলে কি তার থেকেও বড় কিছু হতে চলেছে এখানে? এক মুহূর্তের জন্য ভয়ে বিহ্বল হয়ে উঠল অনিলিখা।

পেরুর এ-এলাকা 'রিং অফ ফায়ার'-এর মধ্যে পড়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অংশে অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। এ জন্যই হয়তো আগের অধিবাসীরা এ জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কাছাকাছির পাহাড়ে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠলে ভারী বিষাক্ত গ্যাস, লাভার স্রোত আর ছাই সবার আগে পাহাড় বেয়ে নীচু উপত্যকা এলাকায় নেমে আসবে, যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন, পাইরোকাস্টিক ফ্লো। 1902 সালে এরকম ভাবেই 'সেন্ট পিয়ের' শহরের সব লোক মারা গিয়েছিল। কিছু বোঝার আগেই পাশের পাহাড়ে জেগে উঠেছিল আগ্নেয়গিরি। তার ছাই, আর বিষাক্ত গরম গ্যাস নেমে এসেছিল পাহাড় বেয়ে উপত্যকায়। এত দ্রুত ছিল সেই স্রোত যে, শহরের লোক পালানোর সময়টুকুও পায়নি। এখানকার ভবিতব্যও কি তাই? চারপাশের পাহাড়ের মধ্যে এটা তো উপত্যকা!

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল অনিলিখা। পালাতেই হবে। এই রাতের মধ্যে। ন্যান্সিকে জানাবে কি? কিন্তু ন্যান্সি পালাবে কী করে? ওর হাতে আরএফআইডি চিপ বসানো আছে। এখানকার সব বিজ্ঞানীর হাতে আরএফআইডি চিপ বসানো আছে, যাতে ড. গিল যে-কোনও সময়ে জানতে পারেন তারা কে কোথায় আছে। কালকে অনিলিখার হাতেও বসানো হবে। সুতরাং অন্য কাউকে জানানো সম্ভব নয়। তাকে একলাই পালাতে হবে।

বিছানায় এসে শুলো অনিলিখা। রাতের বেলা নিশ্চয়ই কেউ এ-ঘরের ক্যামেরাতে চোখ রেখে বসে নেই। একজন মেয়ে একা যে এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করবে না তা এরা নিশ্চিত ধরে নিয়েছে। তবু যতটা সম্ভব সাবধান হতে হবে। অনিলিখা পালাচ্ছে টের পেলেই ড. গিল এখানকার ল্যাবে তৈরি করা হিংস্র জন্তুগুলোকে কম্পিউটার সিগন্যালের মাধ্যমে সজাগ করে তুলবে। তাদের হাত এড়িয়ে তখন পালানো সম্ভব হবে না। অনিলিখা মাথার কাছের আলো নিভিয়ে দিল যাতে ক্যামেরাতে ভালো না দেখা যায়।

খানিক শুয়ে আস্তে-আস্তে চাদরের একপাশ দিয়ে বেরিয়ে এল অনিলিখা। চট করে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল। এবারে? বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হয়নি। সরু চাঁদটা মেঘের চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে। রাতের অন্ধকারে অনিলিখা কাউকে দেখতে না পেলেও, চারদিক থেকে অজস্র চোখ নিশ্চয়ই অনিলিখাকে লক্ষ করছে। কয়েক বছর আগে এক পর্যটক ব্রাজিলের আমাজনের জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল। ষোলো দিন বাদে তাকে উদ্ধার করা হয়। সে যদি ষোলো দিন নিরস্ত্র অবস্থায় বাঁচতে পারে, তাহলে অনিলিখা কেন পারবে না!

জলে ঝাঁপ দিল অনিলিখা। জল বেশ গরম। আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠার আরেক লক্ষণ। মিনিটদশেক সাঁতরাবার পর গাছের ডালে বাধা পেতে লাগল অনিলিখা। আর সাঁতরানোর দরকার নেই, পা পাচ্ছে। গলা অবধি জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটেই যেতে পারবে।

কিন্তু খানিকবাদে আবার সে ভুল ভাঙল। জল আবার বাড়ছে। আবার মিনিট দশেক সাঁতরে খানিকটা উঁচু জমি পেল। লক্ষ একটাই, যত তাড়াতাড়ি পশ্চিমের পাহাড়গুলোকে পিছনে ফেলা যায়!

কিন্তু এভাবে কতক্ষণ? মাটির ওপর পা রেখে জঙ্গল অতিক্রম করা এক রকম, আর আধডোবা জঙ্গল পেরোনো আরেক রকম! পিরানহা, স্ট্রিং-রে, কুমির, অ্যানাকোন্ডা—হাজারো প্রাণীর নজর এড়ানো অসম্ভব। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবু থামার উপায় নেই। মাঝেমধ্যে গাছের ডাল ধরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার সাঁতার।

মোটামুটি দিক আন্দাজ করে এগোচ্ছে চাঁদের আলোর ভরসায়। কিন্তু এরকম জঙ্গলে পাকা শিকারিরাও পথ হারাবে। দু-তিন ঘণ্টা এভাবে যেতে থাকল অনিলিখা। পূবের আকাশ সামান্য আলো ছড়াতে শুরু করেছে। অন্ধকার স্টেজে হঠাৎ আলো ফেললে যেমন হয়, চেনা-অচেনা নানারকম জীবজন্তুর মুখ এদিক-ওদিক দেখা যাচ্ছে। যতক্ষণ অন্ধকার ছিল, দেখাও যাচ্ছিল না, ভয়ও লাগছিল না। নীচে ঘন সবুজ জল। গাছের পাতা পড়ে-পড়ে জলের রংই যেন বদলে দিয়েছে।

এক রাতেই অনিলিখার সাহস অনেক বেড়ে গেছে। মানুষ অত সহজে মরে না। একটা ক্যাপক গাছের ডালের ওপর উঠে বসল। দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে পশ্চিমের বরফ ঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ওখানেই বোধহয় আগ্নেয়গিরি। জেগে উঠলে লাভাস্রোতে বরফ গলে যাবে। তার সঙ্গে যুক্ত হবে বৃষ্টি। আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠার পরই সাধারণত জোরে বৃষ্টি হয়। সেই কাদার স্রোতে পথে যা পড়বে সব ভেসে যাবে।

সালফার ডাই অক্সাইডের বুক জ্বালানো গন্ধ অনেকটা অভ্যেস হয়ে গেছে এখন। সারা গা কেটে ছড়ে গেছে। ক্লান্তিতে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কীসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। অনিলিখার নজর পড়ল খানিকদূরে। সারি-সারি টটোরা নৌকো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। দাঁড় বাওয়া প্রত্যেকটা নৌকোয় একজন কি দুজন বসে। কোনও ইন্ডিয়ান উপজাতি হবে। ওরাই এখন সবথেকে আপনজন।

অনিলিখা গাছ থেকেই পাগলের মতো চিৎকার করে ডাকতে লাগল। ওদের একজনের চোখে পড়েছে। বিষাক্ত তীর ছুড়বে না তো! না, আস্তে-আস্তে লোকটা তার বোট নিয়ে এগিয়ে এল। অনিলিখা গাছ থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে সামান্য সাঁতরে বোটে উঠল। লোকটা কোন উপজাতির জানা নেই। ঠোঁটটা সামনের দিকে অস্বাভাবিকরকম ঝোলা। চিবুকের সঙ্গে এসে লেগেছে। পরনে সামান্য একটুকরো কাপড়। প্রত্যেকেরই ঠোঁট একইরকম। সার-সার প্রায় চল্লিশটার মতো নৌকো। দল বেঁধে এরাও পালাচ্ছে। ওরা নিশ্চয়ই জানে জল এরকম গরম হলে আর এরকম গন্ধ বাতাসে ভাসলে কী করতে হয়। হাজার-হাজার বছর ওরা এই আমাজনেই কাটিয়েছে। অনিলিখাও লোকটার সঙ্গে জোরে দাঁড় বাইতে শুরু করল।

দু-ঘণ্টা প্রায় কেটে গেল। নদীর জল এখন আরও গরম হয়ে উঠেছে। ভোরের সূর্য লাল রং ছড়িয়ে দিয়েছে জলে-গাছের মাথায়। হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ হল। চারপাশ কেঁপে উঠল। 'ক্যা-বুম্'! মুহূর্তে পেছনে ফেলে আসা পশ্চিমের পাহাড়টার ওপর লাল ঘন মেঘ জড়ো হল। ফুলকপির মতো দেখতে সে-মেঘ খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। আবার আওয়াজ হল। তারপর

আবার। প্রত্যেকটা আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে আরেকটা মেঘের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথমে লাল, তারপর কালো রং ধারণ করে সেই মেঘ দ্রুত যেন কাছে চলে আসছে। একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে ঘন কালো চাদরে পাহাড়কে ঢেকে ফেলছে। ওরা প্রাণপণে নৌকো উলটোদিকে বাইতে লাগল। কিন্তু ওই কালো ধোঁয়া যেন খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। জঙ্গলের মধ্যে আওয়াজ বহুগুণ বেড়ে গেছে। ঝাঁক-ঝাঁক পাখি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। 'ক্যা-ক্যা' আওয়াজ করতে-করতে ঝাঁক-ঝাঁক ম্যাকাও উড়ে যাচ্ছে। দলের-পর-দল বাঁদর গাছের ওপর দিকে ঝড় তুলেছে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ছোটো জন্তুদের ছোঁয়ায় পুরো জঙ্গল যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ মেঘটা যেন ঘিরে ধরল অনিলিখাকেও। প্রচণ্ড গরম বাতাস আর ছোট-ছোট কাচের মতো গরম ছাই সারা গায়ে এসে লাগল। দূরের কিছু আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। বাতাস কীরকম ভারী হয়ে উঠেছে। নৌকোর ভেতরটাও এখন গরম হয়ে উঠেছে। এক দল প্যাট্রিক মাছ জল থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠে বাতাসে ভেসে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ চারদিকে পাথর পড়ার আওয়াজ হতে লাগল। চারদিকের জলে-মাটিতে-গাছে পাথর এসে পড়ছে। একটা পোড়া ধাতুর গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। নিশ্চয়ই লাভাস্রোত কাছে চলে এসেছে। আশপাশের গাছে আগুন লাগতে শুরু করেছে। চোখ জ্বলে যাচ্ছে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। নৌকাগুলো সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। নৌকোর সামনে বসা লোকটাকেও আর পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে আবার রাত শুরু হয়ে গেছে।

হঠাৎ অনিলিখার মাথার পিছনদিকে একটা মাঝারি সাইজের পাথর এসে পড়ল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল অনিলিখা। গায়ে শুকিয়ে যাওয়া জামাটার পিঠের দিকটা দ্রুত ভিজে যাচ্ছে। কিছু একটা উষ্ণ তরলপ্রবাহ পিঠ দিয়ে নামছে। নিশ্চয়ই রক্ত। তবু শেষ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজে অনিলিখা ওপরের দিকে তাকাল। মাথার ওপর দিয়ে একটা সামরিক হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে। হাত নেড়ে হেলিকপ্টারটাকে ডাকতে থাকল অনিলিখা। দেখেছে কি না জানা নেই। তবে দ্রুত নেমে আসছে। কিন্তু অনিলিখাকে বাঁচাতে নয়। প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় নেমে এসে পাশের গাছে ধাক্কা খেয়ে জ্বলে উঠল। হয়তো আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের জন্য ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য এরকম উদ্ধারকার্যে হেলিকপ্টারও পাঠানো যায় না।

দাঁড়টা আর হাতে ধরার ক্ষমতা নেই। নিশ্চয়ই অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে। আস্তে-আস্তে দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিল অনিলিখা। হার মেনে নিল চোখে নেমে আসা আঁধারের কাছে।

॥ লিমা, পেরু, 30 জুন ॥

—আজকে কেমন লাগছে অনিলিখা?

—অনেক ভালো। তা কবে ছাড়া পাব?

—আপনি হলেন আমাদের পেরু সরকারের অতিথি। দুর্বল শরীর নিয়ে তো আর এতটা পথ যেতে পারবেন না। আর দু-এক দিনের মধ্যেই আপনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। তারপর যখন ইচ্ছে যাবেন।

ডাক্তার আরও কিছু কথার পর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জানলার বাইরে মেঘলা আকাশ। এত ছাই বেরিয়েছে যে পুরো দক্ষিণ আমেরিকার আকাশই ছাইয়ে ঢাকা। সূর্যের আলোরও প্রবেশ নিষেধ। এ যাত্রায় অনিলিখার প্রাণ বেঁচে গেছে শুধু এক ইন্ডিয়ান উপজাতির জন্য। ওরাই অনিলিখাকে বোট থেকে উদ্ধার করে ওদের গ্রামে নিয়ে যায়। চিকিৎসা করে সুস্থ করে তোলে। এদের কথা আগে অনিলিখার জানা ছিল না। এর কয়েকদিন পরে আগ্নেয়গিরির ত্রাণকার্যে আসা পেরুর সামরিক দপ্তরের লোকেরা অনিলিখাকে উদ্ধার করে। পুরোটাই দুঃস্বপ্নের মতো।

কিন্তু ডঃ গিলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। গিলের টিমের মধ্যে একমাত্র ক্যাথেরিনকে খুঁজে পাওয়া যায়। বোরা উপজাতির লোকেরা ওকে উদ্ধার করে, অনিলিখাই ওকে সনাক্ত করে টিভিতে ছবি দেখে। কিন্তু ওর কিছুই মনে নেই। কীভাবে আমাজনে এসেছিল, কি করত কিছুই বলতে পারেনি। কমপ্লিট মেমারি লস। গিলের আবিষ্কার করা প্রাণীদেরও খোঁজ পাওয়া যায়নি। হয়তো সবই পাহাড় থেকে নেমে আসা কাদাপ্রবাহে চাপা পড়ে গেছে। ওই এলাকায় উদ্ধারকার্য চালিয়েও কোনও প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। হয়তো ড. গিলের আবিষ্কারের কথা কেউ আর জানতেও পারবে না। তবু ড. গিলের কথাটা কানে ভাসে অনিলিখার। বিজ্ঞানীর কাজ বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সমাজকে নয়।

ঘরের ফোনটা বাজতে শুরু করেছে। মাথার কাছেই ফোনটা। কিন্তু এ-ক'দিন কোনও ফোন ওরা এ-ঘরে ট্রান্সফার করেনি। খুব দরকারি ফোন কি? ফোনটা তুলে নিল অনিলিখা। অপ্রত্যাশিতভাবে 'সেটি'-র ডিরেক্টার জিলের গলা।

—কেমন আছ অনিলিখা?

—প্রায় সুস্থ হয়ে গেছি। তা আপনারা কী করে আমার সন্ধান পেলেন?

—তোমার সন্ধান পাওয়াটা এখন খুব সোজা। পেরুর কাগজেও তো তোমার কথা বেরিয়েছে। তা ছাড়া লিমাতে ফিরে আসার পর থেকে আমরা সমানে তোমার খবরাখবর রাখছিলাম। আগে বিরক্ত করিনি তোমার অসুস্থতার জন্য।

—আপনারা কি সংকেতটা পুরো উদ্ধার করতে পেরেছেন?

—হ্যাঁ, সেজন্যই তো ফোন করছি। তুমি মনু জঙ্গলে যেখানে গিয়েছিলে, সে জায়গারই উল্লেখ ছিল সংকেতে।

—আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম। একটু পরে বুঝলেও তারজন্যই আমি আজ বেঁচে আছি। ওরা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল এ বিপর্যয়ের কথা। তাই জানাতে চাইছিল যে, ওখানে পৃথিবীর ইদানীংকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরির জাগরণ হবে। আমাদের ওই এলাকা থেকে সরে যেতে বলছিল।

ফোনের অন্যদিকে জিল চুপ করে আছে। অনিলিখা আবার বলে উঠল,—ঠিক, তাই না?

—না, তাই না। ওখানে কি কোনও অস্বাভাবিক কিছু দেখেছিলে?

—কীরকম? একটু বুঝিয়ে বলবেন?

—এমন কোন প্রাণী দেখেছিলে যা মানবসভ্যতা ধ্বংস করে দিতে পারে। নতুন ধরনের কোনও জীব, ডাইনোসর বা ড্রাগনের মতো।

—কেন? তাই কি ওরা জানিয়েছিল?

—হ্যাঁ, প্রথম সংকেত, যা আমরা 'সেটি'-তে পেয়েছিলাম তাতে এরকমই কোনও প্রাণীর কথা ওরা জানিয়েছিল যা মানবসভ্যতাকে বিপন্ন করতে পারে। আর জানিয়েছিল ওই প্রাণী একমাত্র আছে আমাজনের ওই এলাকায়। দ্বিতীয় সংকেত যা গ্যালওয়ের ক্রপসার্কেলে পাওয়া যায়—তাতে ওরা জানিয়েছিল এজন্য আমাদের ভয়ের কিছু নেই। ওরা বোধহয় জানত যে আগ্নেয়গিরি ওই জায়গায় জেগে উঠবে। আগ্নেয়গিরির জন্যই হয়তো ওই প্রাণী আজ আর নেই। সব নির্মূল হয়ে গেছে। কিন্তু এলই বা কোথা থেকে তা একটা বড় রহস্য। আর এমনকী প্রাণী হতে পারে যা মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে?

অনিলিখা কোনও উত্তর দিল না। চুপ করে রইল। ও সবকিছুই ডক্টর গেরার্ডকে জানিয়েছিল। গেরার্ড সাবধান করে দিয়েছেন—এ ব্যাপারে কারও কাছে কিছু না বলতে।

হয়তো কিছু জিনিস রহস্য থাকাই ভালো। ঠিক যেমন ওই ইন্ডিয়ান উপজাতির কথা, যারা অনিলিখাকে বাঁচিয়েছিল। হয়তো ওদের খোঁজ আর

কোনওদিনই পাওয়া যাবে না। ওদের কথা পেরুর কোনও উপজাতি বিশারদেরও জানা নেই। কোনও নথিভুক্ত উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ওরা পড়ে না। যখন জ্ঞান ফিরেছিল, তখন একটা জিনিস দেখেই অনিলিখা খুব অবাক হয়েছিল। ওদের কোনও ভাষা নেই। লিখিত হরফও নেই। ওরা নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময় করে শুধু নানান আকারে নানান অবস্থানের বৃত্ত এঁকে। ওরা কি তবে অ্যালিয়েনদেরই একদল? যারা লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে আছে, অথচ আমরা কেউ জানি না। ঠিক ওই গুহার অজানা পোকাটার মতো।

লক্ষ বছর আগে যখন ওরা পৃথিবীতে এসেছিল, হয়তো ওদেরই কয়েকজন রয়ে গিয়েছিল এ পৃথিবীর টানে। যুগের পরে যুগ কেটেছে। এসেছে প্রজন্মের পরে প্রজন্ম। কিন্তু ওদের ভাষা বদলায় নি। ওদের ভাষা আজও তাই বৃত্তের ভাষা। আর সে ভাষাই ওদের রক্ষা করে।





রহস্য যখন নিজেকে নিয়ে

॥ 18 অক্টোবর, 2051, বুধবার, দুপুর আড়াইটে ॥

ঘাসের ওপর উঠে বসল ঋক। ফিরফির করে হাওয়া বইছে। হালকা শীতের রোদ্দুর এসে পড়েছে সারা গায়ে। মাথার ওপরে হাওয়ায় দুলতে থাকা গাছের পাতাগুলোর মধ্যে ছেঁড়া আকাশকে নিয়ে টাগ-অফ-ওয়ার চলছে। চারদিকে নানান রঙের ফুল। একটু দূরে একটা ফোয়ারা। বেশ সাজানো বাগান।

উঠে দাঁড়াল ঋক। পাশ দিয়ে গঙ্গার ক্ষীণস্রোত বয়ে যাচ্ছে। ঋক আগে এখানে এসেছে। কী যেন নাম জায়গাটার? ঝিলিমিলি। কিন্তু এখানে ও এল কী করে? হাতের ঘড়িটা একনজর দেখে নিল। আড়াইটে। অফিসের সময়। এরকম সময় তো ও কখনও অফিস থেকে বেরোয় না! আজ হঠাৎ কী হল? ঘাসের ওপর শুয়ে থাকারই বা কী কারণ থাকতে পারে?

নিজের পুরো শরীরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। নাহ্, কোথাও চোট নেই। শুধু শেষ কয়েক ঘণ্টার হিসেব যেন হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে।

ভালো করে মনে করার চেষ্টা করল ঋক। ঠিক কী হয়েছিল সকাল থেকে? হ্যাঁ, রোজকার মতোই রজনীশ ওর ল্যাপটপ আর খাবারের ব্যাগ গুছিয়ে দিয়েছিল। পরিষ্কার মনে পড়ে—ও জিগ্যেস করেছিল কী খাবার আছে। উত্তর পেয়েছিল—ভিটামিন A আর C—বিরিয়ানি টেস্ট।

ঠিক সাড়ে আটটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল ঋক। তারপর গাড়ি করে দমদম। সেখানে গাড়ি পার্ক করে ম্যাগলেভ ট্রেনে উঠে বসেছিল। বেশ ভিড় ছিল ট্রেনটাতে। বসার জায়গা পায়নি। তারপর ট্রেন থেকে কি আর নেমেছিল? কিছুই মনে আসছে না। ফোন-ফোনটা কোথায়? ওখান থেকে যদি কোনও সূত্র মেলে। জামার হাতায় লুকোনো ফোনটা সুইচ টিপে বের করে নিল ঋক।

বেশ কয়েকটা মিস্‌ড কল এসেছে। দশটায় প্রথম কল। অফিস থেকে বক্সীর। সাড়ে দশটায় আবার বক্সীর। করবেই তো! দশটায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ বালীর ডেটা সামলানোর কাজটার জন্য স্ট্র্যাটেজিক মিটিং ছিল। ছিঃছিঃ! কীভাবে মুখ দেখাবে? এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন ও জীবনে হয়নি। মিঃ বক্সী শুধুমাত্র ওই মিটিংটার জন্যই ডেনভার থেকে একদিনের জন্য এতটা জার্নি করে এসেছেন।

অফিসে ফোন করে ক্ষমা চাওয়া উচিত। ফোন করতে গিয়ে আবার থেমে গেল ঋক। কী বলবে? ভুলে গিয়েছিল? শীতের রোদের টানে ঝিলিমিলিতে বেড়াতে এসেছিল? না কি বলবে শেষ কয়েকঘণ্টা ওর কোনও জ্ঞান ছিল না। নাহ্, আসল কারণটা বোঝা দরকার।

অন্য মিসড কলগুলো দেখতে থাকে ঋক। অস্ট্রিয়া থেকে মনিদীপার, বারোটায় —সাড়ে বারোটায়—শেষবার দেড়টায়। এতবার! ওখানে তো সবে সকাল হয়েছে। কোনও বিপদ হল না তো? হঠাৎ ফোনের তারিখের দিকে তাকাতেই একটা শিহরণ হল। ১৮ অক্টোবর। ঋভুর জন্মদিন। ঋভু ঋকের ছোট ছেলে। এবার ছ'য়ে পড়বে। মেলবোর্নে একটা হোস্টেলে থেকে কেজিতে পড়ছে। গত একবছর আছে।

মনির সঙ্গে একসঙ্গে আজ রাতে মেলবোর্নে যাওয়ার প্ল্যান ছিল। একসঙ্গে ঋভুর জন্মদিন সেলিব্রেট করা হবে। সেজন্যই মনি ফোন করছিল হয়তো। এরকম একটা দিন—অথচ ও ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে অর্ধেক দিন কাবার করে দিয়েছে! নিজের ওপর বিরক্তিতে ধিক্কার এল ঋকের।

কিছু দূরে বসা কাকটার সঙ্গে চোখাচোখি হতেও যেন লজ্জা পেল ঋক। এখনকার ব্যস্ত সমাজে এসব জায়গায় শুয়ে-বসে থাকে অন্য জায়গা থেকে আসা ইল্লিগাল ইমিগ্র্যান্টরা আর প্রথম শহর দেখতে আসা গ্রাম্য লোকেরা। আজ ঋক ওদের দলে নাম লিখিয়েছে। চেনা-পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে লজ্জায় আর মুখ দেখানো যাবে না।

ফোনে নাম্বার ডায়াল করে ঋক।

—হ্যালো, হ্যালো, মনি শুনতে পাচ্ছ?

—কী ব্যাপার? তোমাকে ফোন করে করে পাচ্ছি না। আজকে রাতের প্ল্যান সব মনে আছে তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—এত সহজে ভুলে যাব? ঠিক দশটায় মেলবোর্ন এয়ারপোর্টে মিট করব। তারপর ওখান থেকে সোজা ঋভুর হোস্টেল।

—কেকটা অর্ডার করতে ভুলো না। টেস্ট করে তবেই অনলাইনে অর্ডার কোরো। ও তো জানো চকোলেট খুব পছন্দ করে।

—তোমার তো সব ছোটখাট ব্যাপার মনে থাকে! ঠিক আছে, পয়েন্ট নোটেড। জানো! আজ একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে।

—কী, কী হয়েছে? ট্রান্সফার? শরীর ঠিক আছে? কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে? মনিদীপার উদ্বিগ্ন গলা ভেসে আসে।

—না, না, সেসব কিছু নয়। থাক, দেখা হলে বলব। সে এক মজার কাণ্ড।

—ঠিক আছে, আমারও একটা কল আসছে। মনে রেখো ঠিক দশটা।

—ওকে—ফোনটা কেটে দিল ঋক।

অদ্ভুত মেয়ে মনি। ঋভুর মা নয় মনি। সারিতার মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যেই মনির সঙ্গে আলাপ। সে পাঁচমাস আগের কথা। মনি এখনও ঋভুকে সামনা-সামনি দ্যাখেনি। মাঝেমধ্যে ফোন করেছে শুধু। অথচ ঋভুর পছন্দ-অপছন্দ সব এর মধ্যেই নখদর্পনে। খুব সিস্টেমেটিক। ভিডিও ফোনের রেকর্ডিং বারবার চালিয়ে শোনে। দরকারি কথাগুলো পামটপে নোট করে নেয়।

আচ্ছা, এখন একবার ঋভুর সঙ্গে কথা বলে নিলে তো মন্দ হয় না! তবে রাতে যাওয়ার ব্যাপারটা বললে চলবে না। ওটা সারপ্রাইজই থাক। বেশ কয়েকমাস পরে মুখোমুখি দেখা হবে। ও শুনেই নিশ্চয়ই আহ্লাদে আটখানা হবে। নাম্বার ডায়াল করতে গিয়ে থেমে যায় ঋক।

প্যান্টের পকেটে মানিব্যাগটা আছে তো? নেই! বুক কেঁপে ওঠে ঋকের। প্যান্টের দু-পকেট হাতড়াতে থাকে। না পেয়ে দ্রুতপায়ে ফিরে আসে আগের জায়গায়। এদিক-ওদিক কোথাও পড়ে গেল নাকি? কোথাও সামান্য আগাছাও পড়ে নেই। সামান্য কিছু পড়ে থাকলেও ঠিক চোখে পড়বে। তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে। সর্বনাশ! মানিব্যাগটা চুরি হয়ে গেল না তো?

মানিব্যাগটা নিয়ে চিন্তা নয়। চিন্তাটা আইডেনটিটি কার্ডটা নিয়ে। ওটা তো মানিব্যাগেই ছিল। না পেলে সর্বনাশ। ও যে ব্যারাকপুরের বিদ্যাসাগর কলোনির বাসিন্দা ঋক, সেটা প্রমাণ করা শক্ত হয়ে যাবে। উদভ্রান্তের মতো ঘাসের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজতে থাকে ঋক।

মিনিটদশেক বাদে হাল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এর মধ্যেই ও ঘেমে নেয়ে গেছে। গরমে নয়। টেনশনে—আর খানিকটা পুরো চত্বরটা হামাগুড়ি দেওয়ার পরিশ্রমে। মাথা ঘুরছে। চুরি?

এখনকার দিনে চুরি খুবই অস্বাভাবিক। চোর ঠিক ধরা পড়ে যাবে, আর চুরি হবেই বা কীসের জন্য? মানিব্যাগে তো দামি কিছু ছিল না। হ্যাঁ, আইডেনটিটি কার্ডটা ছিল। কিন্তু ওটা তো কয়েকঘণ্টার মধ্যেই স্যাটেলাইট দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে। মুশকিলটা হল এই মাঝের কয়েক ঘণ্টা।

যা-ই করতে যাক না কেন আইডেনটিটি কার্ড লাগবে। বাসে ওঠা যাবে না, ট্রেনে ওঠা যাবে না। দোকানে ঢোকা যাবে না। কিছু কেনা যাবে না। উপায় একটাই। অফিসে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য নিয়ে পুলিশে যোগাযোগ করা। আইডেনটিটি কার্ডটা যত তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করা যায়। একা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা মানেই হয়রানি। হাজাররকম প্রশ্ন। হয়তো ক্রিমিনালই ভেবে বসবে।

পার্ক থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ ধরে অফিসের দিকে হাঁটতে শুরু করে ঋক। অফিস ছ-সাত মাইলের পথ। তবে অনেকটা পথ জুড়ে চলন্ত ফুটপাথ আছে।

সেটাই ভরসা। শহরের কেন্দ্রে যাতে দূষণ কম হয়, তাই গাড়ি চালানোর ওপর নানারকম বিধিনিষেধ আছে। ঋক একা নয়। আরও অনেকেই হেঁটে চলেছে। একটাই তফাত, তারা নিশ্চিন্তে নির্ভীক ভাবে হেঁটে চলেছে। আর ঋক? প্রতি পদক্ষেপে দ্বিধা। কিছু ভুল হল না তো?—যে-কোনও সময় পুলিশ যদি জানতে পারে যে ওর আইডেনটিটি কার্ড হারিয়ে গেছে, তৎক্ষণাৎ ওকে থানায় ধরে নিয়ে যাবে।

ঋক জীবনে কখনো থানার ধারেকাছে যায়নি। আর কিছু না—হাঙ্গামা। কী করে হারাল, কখন হারাল, কোথায় হারাল—প্রশ্নগুলোর কোনও উত্তরই ঋকের কাছে নেই। তখনই ওরা আরও সন্দেহ করবে।

আর মানিব্যাগে রাখা—সেটাই তো সব থেকে ভুল। আজকালকার দিনে কেউ মানিব্যাগে আইডেনটিটি কার্ড রাখে না। মনি অন্তত হাজারবার সাবধান করেছে। বলেছে হাতে ইমপ্ল্যান্ট করে নিতে—সবাই যেরকম করে। নাহ্, এবার পাওয়া গেলে প্রথমেই ওটা করতে হবে।

পাশ দিয়ে ট্রামগুলো সমানে চলে যাচ্ছে, ব্যাটারি চালিত ট্রাম। কোনও ভাড়া নেই। উঠে বসলেই হল। শুধু ওই কার্ড থাকা দরকার। না থাকলেই ট্রামের সেনসরে ধরা পড়ে যাবে। সিগন্যাল চলে যাবে কাছের পুলিশ স্টেশনে—পাকড়াও বেআইনি সওয়ারিকে।

ফুটপাথ ধরে যেতে যেতেও সাবধান হচ্ছিল ঋক। অনেক বড় দোকান, গাড়ির ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের সামনেও সেনসর থাকে। তাতেও ধরা পড়ে যায় আইডেনটিটি কার্ড ছাড়া লোকজন। ব্যস, ট্র্যাকিং চালু হয়ে যাবে।

অনেকদিন বাদে এরকম চড়া রোদে হাঁটছে ঋক, টেনশনও হচ্ছে। হঠাৎ মাথাটা যেন একটু ঘুরে গেল। আর তখনই মনে হল ওর মতো দেখতে একটা লোক এগিয়ে আসছে। লোকটা পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বের করে মুহূর্তের মধ্যে মুখের সামনে স্প্রে করে দিল। সবুজ ধোঁয়া, ঝাঁঝালো গন্ধ। চোখের সামনে হঠাৎ নেমে এল অন্ধকার।

—আর ইউ ওকে?—একটা তুলোর মতো সাদা চওড়া পাকানো গোঁফ। মুখে বয়সের বলিরেখা। মুখটা আস্তে-আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারপর চেহারাটা। একটা লোক ওর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রে-স্যুট পরা একজন বছর আশির লোক। ও ফুটপাথের ধারে রাখা একটা বেঞ্চে বসে আছে। ঘেমে জামা গায়ে লেপটে আছে। আবার খানিকক্ষণের জন্য ব্ল্যাকআউট। কী যে হচ্ছে আজকে, এরকম অদ্ভুত ইলিউশান দেখছে!

—ডাক্তার ডাকব? শরীর খারাপ লাগছে? লোকটা আবার বলে উঠল।

—না, না, আই অ্যাম অ্যাবসলিউটলি ফাইন। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে গিয়েছিল। বোধ হয় এই রোদের জন্য। অভ্যাস নেই তো!

—নেগলেক্ট করবেন না। চেক আপ করে নিন। আমারও মাসদুয়েক আগে একদিন এরকম হয়েছিল। ভাগ্যিস ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। দেখা গেল হার্টের অবস্থা একদম লজঝরে। সঙ্গে-সঙ্গে হার্ট চেঞ্জ করে দিল। নাউ লুক অ্যাট মি। লোকটা গা ঝাঁকিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল,—এক ঝটকায় বয়স যেন দশবছর কমে গেছে।

—ঠিকই বলেছেন। আজ বাড়ি গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে নেব। এখন একটু ব্যস্ততা আছে। বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ঋক। লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। ভাগ্যিস লোকটা আগ বাড়িয়ে ডাক্তার ডাকেনি। কার্ডের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যেত।

আচ্ছা, হঠাৎ করে ওর এরকম অনুভূতি হল কেন? না কি এরকম কিছুই আজ ওর সঙ্গে হয়েছে? কেউ কি ওকে বেহুঁশ করে ওর আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে গেছে? নানান ধরনের চিন্তা করতে করতে হাঁটতে থাকে ঋক।

মিনিটদশেকের মধ্যে অফিসে পৌঁছে যায়। গেটের কাছে দুটো রোবট গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। আইডেনটিটি কার্ড ছাড়া কোনওভাবেই ওরা ঢুকতে দেবে না। ওরা 'ইয়েস-নো'-তে কথা বলে। কোনও যুক্তির ধার ধারে না। একমাত্র উপায় অনি-কে ফোন করা। ওকে গেটের বাইরে বেরিয়ে আসতে বলা। তারপরে দুজনে মিলে আলোচনা করে যা হোক একটা কিছু করা যাবে।

॥ ঋক ডায়াল করল,—66... ॥

—হ্যালো অনি, আমি ঋক বলছি।

—হ্যাঁ, বুঝেছি। কী ব্যাপার বল তো, সকাল থেকে কোনও পাত্তা নেই। টপ বস তো একদম ফায়ার, এত ইম্পর্টান্ট মিটিং ছিল।

—বলছি, একটা বড় ঝামেলায় পড়ে গেছি।

—কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি তো? শরীর ঠিক আছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেসব ঠিক আছে, তার থেকেও বড় ঝামেলা, আইডেনটিটি কার্ড হারিয়ে ফেলেছি।

—হোয়াট? স্টোলেন? কী করে হল? কতবার বলেছি, শরীরে ইমপ্ল্যান্ট করে নে। ওসব জিনিস মানিব্যাগে রাখতে নেই।

ঋক খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে ওঠে,—কী করব বুঝতে পারছি না। তুই একটু বেরিয়ে আয়। একসঙ্গে ভেবে যা হোক একটা কিছু করা যাবে।



—আসছি, এখুনি আসছি। ফোন কেটে যায়।

অনি খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আজকালকার দিনে কেউ কারও বন্ধু হয় না। সময়ই নেই। আয়ু বেড়েছে, কিন্তু সময় বাড়েনি। দ্রুত যাতায়াতের অনেক উপায় বেরিয়েছে। সবার কাছে ভিডিওফোন, যোগাযোগের সব ধরনের উপায়। কিন্তু যোগাযোগের ইচ্ছেটাই চলে গেছে। তাই সম্পর্কের দূরত্ব কিছু কমেনি, আরও বেড়ে গেছে। তবু অনির কথা ভেবে বুকটা খানিকটা হালকা হল। এখনও জীবনের সব রং হারিয়ে যায়নি।

ঋক দাঁড়িয়ে থাকে। পাঁচমিনিট-দশমিনিট-পনেরোমিনিট—কী করছে এতক্ষণ অনি! হঠাৎ দূর থেকে সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া যায়। সাইরেনটা এদিকেই এগিয়ে আসছে। মিনিটখানেকের মধ্যেই চার-চারটে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়ায়।

বিকেলের ক্লান্ত রোদের মধ্যেও গাড়িগুলো আলোয় ঝলমল করছে। লাউডস্পিকারে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে,—ডোন্ট ট্রাই টু মুভ, স্ট্যান্ড স্টিল, রেইজ ইওর হ্যান্ডস।

নির্দেশগুলো ঋককেই উদ্দেশ্য করে। কাছাকাছি আর কেউ নেই। হতবাক ঋক হাত তুলে দাঁড়িয়ে যায়। গাড়ি থেকে চারজন পুলিশ নামে, তিনটে রোবট পুলিশ, একজন মানুষ। সতর্কভাবে একপা-একপা করে তারা ঋকের দিকে এগিয়ে আসে। নজর এক মুহূর্তের জন্যও ঋকের থেকে না সরিয়ে।

ঋকের কাছে হাস্যকর লাগে। ওর মতো নিরীহ লোক, যে আরশোলা দেখে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়, তাকে চার-চারজন সশস্ত্র পুলিশ এত ভয় পাচ্ছে। একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে ওর হাতে একটা কার্ড লাগিয়ে দেয়। ওই কার্ড লাগানোর অর্থ, বেচাল কিছু দেখলেই রিমোটের সুইচটিপে ঋককে অজ্ঞান করে দিতে পারবে ওরা।

—আপনাকে আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

—কেন?

—আমরা খবর পেয়েছি আপনার কাছে আইডেনটিটি কার্ড নেই। আপনি সেটা আমাদের জানানোরও প্রয়োজন মনে করেননি।

—সেটা জানানোর জন্যই তো এখানে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম অফিসের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাব। দাঁড়ান, আমার বন্ধু অনিকে একবার ডেকে নিই। ও আমার সঙ্গে যাবে।

—এমনিতেও উনি সঙ্গেই যাবেন। ওনার কাছ থেকেই খবর পেয়েছি।

কথাটা ঋকের কাছে প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হলেও পরক্ষণেই ভুল ভাঙল। অফিসের গেটের অন্যদিকে শুধু অনি নয়, অফিসের আরও বেশ কয়েকজন জমায়েত হয়েছে। অনি এগিয়ে আসে।

—ঋক, তুই আমাকে ভুল ভাবিস না। আমি তো আর আমাদের কোম্পানির পলিসির বিরুদ্ধে যেতে পারি না। এ ধরনের ক্ষেত্রে প্রথমেই পুলিশকে জানানোর নিয়ম।

—কিন্তু তুইও কি আমাকে চিনতে পারছিস না? তোর মধ্যে কি কোনও সন্দেহ আছে? আচ্ছা, লেট মি রিকালেক্ট। গতকাল-গতকাল ঠিক তিনটের সময় আমরা নতুন প্রজেক্টের প্ল্যানটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তারপর সাড়ে তিনটেতে একটা মিটিং ছিল। না গিয়ে আমরা 'মুন ল্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন'-এর শেয়ার নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তুই এ-ও বললি যে শেয়ার না কিনে ডাইরেক্টলি চাঁদের জমি কয়েকজন মিলে কেনা যেতে পারে। ভালো ইনভেস্টমেন্ট। ঠিক কি না?

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস।

—তো! আমি ছাড়া অন্য কেউ হলে জানা সম্ভব এসব কথা! পরশুদিন মিঃ সেনকে নিয়ে যে কথাটা আমাকে বললি—বলি সে কথাটা? একবার আমাকে দেখে, কথা বলে তারপরেই না হয় পুলিশ ডাকতিস। শুধু-শুধু ঝামেলা বাড়ানো।

—চিন্তা করিস না ঋক। আসলে আশিসও বলল। জানিসই তো একই লোকের কত ক্লোন সম্ভব। তোর মতোই দেখতে শুনতে আরও কতজন আছে কে জানে! অনেকেই তো তোর বাবা-মায়ের মতো ঋষিকে ক্লোন করেছে। ছেলে বড় ক্রিকেটার হবে ভেবে। শুধু দেখা কেন, তাদের অনেকেরই হাবভাব-কথাবার্তা সব অবিকল তোরই মতো হয়তো। এখন কী করে আমরা সে রিস্ক নিই! ভুল হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি তোর সঙ্গেই থাকব। তোকে বের করে আনার দায়িত্ব আমার।

ঋককে আলাদা একটা গাড়িতে তোলা হল। মিনিটদশেকের মধ্যে ওকে নিয়ে আসা হল স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। থানায় যে ঘরে নিয়ে গিয়ে ওকে বসানো হল তা অত্যাধুনিক হোটেলের ঘরকেও হার মানায়। সারাদিন যা ধকল গেছে, সোফায় বসেই গা এলিয়ে দিল ঋক। ঝটপট নিজের কাজ ঠিক করে নিল। ডেকে নিতে হবে মনিকে, ডেকে নিতে হবে ঋভুকে, বাড়ি থেকে রজনীশকে। এরাই ঋকের সবথেকে আপনজন। আর অনি তো আছেই।

এরা প্রত্যেকেই যদি ঋককে ঠিকভাবে সনাক্ত করতে পারে, তা হলে ওরা আর ডিএনএ টেস্ট পর্যন্ত ঋককে ধরে রাখবে না। টেস্ট করতে তো অন্তত দু-দিন লাগবেই। থানাতে রাত কাটানো অসম্ভব। যেভাবেই হোক ঋভুর জন্মদিন একসঙ্গে সেলিব্রেট করতে হবে। ফোন করতে যায় ঋক। নেটওয়ার্ক ব্লক্ড।

উত্তেজিত হয়ে ফোনটা সোফায় আছড়ে ফেলে একটা বিশ্রী গালাগাল করে ওঠে ঋক।

॥ 18 অক্টোবর, বুধবার, রাত ন'টা ॥

স্পেশাল ডিরেক্টার ক্রাইম ব্রাঞ্চ—মি. ব্রায়ান। সঙ্গে আরও দুজন ইন্টেলিজেন্স স্কোয়াডের পুলিশ। ঘরে আছে আরও দুটো রোবট পুলিশ, যাদের কাজ লাই ডিটেক্টরের সাহায্যে ঋক সত্যি বলছে কি না তা যাচাই করা। পুরো কথার মধ্যে কোনও অসঙ্গতি আছে কি না তা দেখা।

এ ছাড়া ঋকের মাথায় লাগানো যন্ত্রের সাহায্যে ব্রেন ফিঙ্গারপ্রিন্টিং চলছে। একঘণ্টা ধরে প্রশ্নোত্তর চলছে। কোথায় পড়াশুনো করেছ? কতদিন কোথায় কাজ করেছ? কবে কোথায় থেকেছ? ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে নানান প্রশ্ন। কবে প্রথম বিয়ে? কীভাবে প্রথম স্ত্রী মারা গেল? কী করে কার্ড হারাল? নানান প্রশ্ন, ঋক বিরক্ত হলেও উত্তর দিয়ে গেছে।

কাচের ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে মনি, অনি, ঋভু। ওদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে ঋকের কথার সত্যতা যাচাই-এর জন্য, সনাক্তকরনের জন্য। প্রথমে মনিকে ডাকা হল।

মনি বোধহয় সোজা অফিস থেকেই এসেছে। অফিসের পোশাক। এতক্ষণে স্বস্তি পেল ঋক। মনি স্মার্ট মেয়ে। ওকে যা-যা প্রশ্ন করা হল সবেরই সোজা সাপটা উত্তর দিল মনি। ওর কোনও সন্দেহ নেই যে ঋকই ওর স্বামী। তবু রীতিমতো ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্ন ঋককে মনির সামনে করতে দ্বিধা করলেন না মিঃ ব্রায়ান। এমন কিছু প্রশ্ন যা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ঋকও খানিকটা বিরক্তি, খানিকটা রাগ নিয়ে উত্তর দিয়ে গেল।

রেজাল্ট, ঋক সম্বন্ধে মনি একশোভাগ নিশ্চিত। মনি নিজ দায়িত্বে বন্ড সই করে ঋককে নিয়ে যেতে রাজি।

এরপর একই ভাবে ডাকা হল অনি ও ঋভুকে। ঋভুর ক্ষেত্রে দুজনকে আলাদা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করে মিলিয়ে নেওয়া হবে। ঋকের ভয়ে বুক দুরদুর করছিল। হাজার হোক, ছয় বছরের ছেলে। যথেষ্ট বুদ্ধি রাখে যদিও, কিন্তু বাইচান্স ওর দিক থেকে ও যদি কিছু ভুলে যায়।

হলও তাই। শেষবার যখন দেখা হয়েছিল তখন ঋক ওকে কী গিফট দিয়েছিল, উত্তরটা ঋকের সঙ্গে ঋভুর মেলেনি। অথচ ঋকের স্পষ্ট মনে আছে ঋভুকে সেবার ও একটা দুর্মূল্য ফাউন্টেন পেন দিয়েছিল। কিন্তু ঋভু তার বদলে

লিখল রিমোট কন্ট্রোল রোবট, যেটা ও আগেরবার পেয়েছিল।

তবে ভাগ্য ভালো। বাকি সব উত্তর মিলে গেছে। ঋভুও এত জটিলতা না বুঝে প্রশ্নের মাঝেই দু-তিনবার এসে জড়িয়ে ধরেছে ঋককে। মানুষ কেন, রোবটরাও নিশ্চয়ই এর অর্থ বোঝে। ব্রেন ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এ ও কোনও গন্ডগোল ধরা পড়েনি। কথা ও ভাবনার মধ্যে সামান্য ফাঁক থাকলেও রেজাল্ট নেগেটিভ হত।

ঠিক এই সময় খবরটা এল। মিঃ ব্রায়ান ফোনে কার সঙ্গে কথা বললেন। আর তারপরই ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন,—অ্যাই অ্যাম স্যরি ঋক। আপনাকে কিন্তু আজ ছাড়া যাচ্ছে না। এই মাত্র খবর পেলাম শ্রীলঙ্কা থেকে ভ্যাসিল ডি'সিলভা নামে এক আন্তর্জাতিক টেররিস্ট কয়েকদিন আগে ভারতে প্রবেশ করেছে। ও একটা টেররিস্ট গ্রুপের বড় লিডার। নানান মহাদেশের পুলিশ বহুদিন ধরে ওকে খুঁজছে। হেরোইন পাচার, ইউরেনিয়াম চুরি, ভাইরাস ছড়ানো—নানান ধরনের দুষ্কর্মে যুক্ত আছে ডি'সিলভা। আনফরচুনেটলি ওকে দেখতে একদম আপনারই মতো।

ঋক কিছু বলার আগেই মনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠল,—হোয়াট ডু ইউ মিন? ওর মতো আরও হাজারটা লোক আছে। তাদের যে কেউ কোনও অপরাধ করলেই ও আটকে যাবে? আমরা সবাই নিশ্চিত যে ও-ই ঋক। এতদিন ওকে চিনি, এতবড় ভুল করব? চেহারা এক হতে পারে, হাবভাব—কথাবার্তা তো আর এক হবে না!

—মাত্র কয়েকটা দিনের তো ব্যাপার। আমাদেরও নিশ্চিন্ত হতে দিন। আপনাদের সাক্ষ্যের বাইরে ও যে ডি'সিলভা নয়, তার আর কোনও প্রমাণ কিন্তু আমরা পাইনি। আরেকটা জিনিস জানবেন যে, ঋক এমন একটা সংস্থার অফিসার যা বহুদিন ধরেই সন্ত্রাসবাদীদের টার্গেট। সারা এশিয়ার বড়-বড় ব্যাঙ্কের স্পেশাল নেটওয়ার্ক ও তথ্যের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে ওই সংস্থা। কোনওরকম ভাবে ওই সংস্থার কাজ ব্যাহত করতে পারলে সারা এশিয়ার অর্থনীতি ভেঙে পড়বে।

—তা সেক্ষেত্রে আমরা দেখব যাতে ও অফিসে না যায়। অন্তত যতদিন আপনারা না নিশ্চিত হন। ওকে তো ঘরেও বন্দি করে রাখা যায়, তাই না? অনি বলে ওঠে।

মনিও বলে ওঠে,—প্লিজ অফিসার, আজ আমাদের ছেলে ঋভুর জন্মদিন। আমরা একসঙ্গে সেলিব্রেট করতে চাই, দয়া করে দিনটা আর মাটি করবেন না। আচ্ছা, এতক্ষণ যে প্রশ্নগুলো করলেন, তারপরেও কি সত্যিই কোনও সন্দেহ আছে আপনার? কোথায় ঋক আর কোথায় এক আন্তজার্তিক টেররিস্ট, ও কি তা হলে এত সহজে ধরা দিত?

মিঃ ব্রায়ান চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবলেন। বলে উঠলেন,—ঠিক আছে। আপনারা যখন এতটাই শিওর, তখন যেতে দিচ্ছি। তবে ওর পায়ে আমরা ট্যাগ লাগিয়ে রাখব। সর্বক্ষণ ক্যামেরাবন্দি। অফিস বা কোনও হাই সিকিউরিটি জোনে ওনার যাওয়া নিষিদ্ধ। যতক্ষণ না আমরা ক্লিয়ারেন্স দিচ্ছি, বেটার হবে যদি উনি বাড়িতেই থাকেন।

একটু থেমে একটা তালু বন্দি কম্পিউটার মনিদীপার দিকে এগিয়ে মিঃ ব্রায়ান বলে উঠলেন,—আপনাকে এজন্য বন্ডে সই করতে হবে।

।। 19 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, সন্ধে ছ'টা ।।

একটু এদিক-ওদিক চেয়ে লোকটা রেস্টুরেন্টের দিকে এগিয়ে গেল। গায়ে দামি কালো কোট। সঙ্গে মানানসই প্যান্ট আর টি-শার্ট। রেস্টুরেন্টে ঢুকে কোণের দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসল মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে।

ওয়েটার এগিয়ে এসে মাঝের দিকের একটা টেবিল দেখিয়ে বলে উঠল,—আপনি ওখানেও বসতে পারেন। ওখানে আপনি আপনার পছন্দমতো সিনারিও বেছে নিতে পারেন। এ টেবিলটায় সে ফেসিলিটি নেই।

শুনে লোকটা খানিকটা যেন বিরক্ত হয়েই বলে উঠল—নো, নো, আই অ্যাম ফাইন। আমার অর্ডারটা একটু তাড়াতাড়ি আনবেন। ব্যস্ততা আছে। দুটো গ্রিলড চিকেন স্যান্ডুইচ।

রোবট ওয়েটার নিয়ম মাফিক বলেছিল। সবাই পছন্দমতো পরিবেশ তৈরি করে খেতে পছন্দ করে। একটা সুইচ টিপলেই আমাজনের জঙ্গল বা প্যারিসের স্যেন নদী কিংবা কানাডার নায়াগ্রা জলপ্রপাত হাজির হবে টেবিলের পাশে। ভার্চুয়াল রিয়ালিটির দৌলতে। তবে তার জন্যে খানিকটা জায়গা লাগে। তাই জায়গা থাকলে কেউ আর এই কোণের টেবিলগুলোতে বসে না। কে কোথায় বসল তাতে অবশ্য ওয়েটারের কিছু আসে যায় না। নির্বিকারভাবে বলল,—থ্রি মিনিট টুয়েন্টি সেভেন সেকেন্ড লাগবে, থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য অর্ডার।

লোকটা মাথা নেড়ে 'ওকে' বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। আবার পরক্ষণেই সোজা হয়ে বসে সামনে রাখা গ্লাসের জল ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল। মুখে চোখে অস্থিরতা। ক্লান্তির ছাপ। কনুই টেবিলে রেখে কপালে হাত দিয়ে সামনে ঝুঁকে বসল। গতকাল থেকে সমানে শুধু ছুটে বেড়াচ্ছে, ক্যামেরা এড়িয়ে, বড় দোকান এড়িয়ে। রাস্তার অটোমেটেড টোল ট্যাক্সের বুথ এড়িয়ে। এখন পেটের খিদের কাছে হার মেনে বাধ্য হয়েছে রেস্টুরেন্টে ঢুকতে।

খাবার আসতেই কোনওরকম সৌজন্য না দেখিয়ে গোগ্রাসে খেতে শুরু করল লোকটা। শেষ করে আরেকটা স্যান্ডুইচ অর্ডার করল। তারপরে কী খেয়াল হতে আবার ওয়েটারকে ডেকে জিগ্যেস করল,—টাকা—মানে ক্যাশ অ্যাকসেপ্ট করো তো?

—ইয়েস স্যার।

নিশ্চিন্ত হল লোকটা। বেশিরভাগ জায়গায় এখন টাকার ব্যবহার একদম উঠে গেছে। সবই চলে আইডেনটিটি কাম ক্রেডিট কার্ডের কৃপায়। সব কার্ডের জায়গা নিয়েছে শুধু একটা কার্ড। সর্ব ঘটে কাঁঠালি কলা। আর সেটাই ব্যবহার করা যাবে না। মুহূর্তে ওর মুখোশ খুলে যাবে। প্রমাণ হয়ে যাবে ঋকের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া কার্ডটা ওর কাছে আছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওই কার্ড নিয়ে তল্লাশি চলছে। যদি অবশ্য ঋক ধরা পড়ে থাকে।

আচ্ছা, ঋকের কার্ডটা নিয়ে ও বোকার মতো ঘুরছে কেন? এসব কার্ড সহজেই ট্র্যাক করা যায়। এধরনের কার্ড হারানোর রিপোর্ট এলেই পুলিশ ট্র্যাকিং চালু করে দেয়। ট্র্যাকিং চলাকালীন কোনও বড় অফিস-রেস্টুরেন্টের ক্যামেরাগুলোতে ধরা পড়লেই হল। সেনসর ওই বিশেষ কার্ড চিহ্নিত করে জানিয়ে দেবে সেন্ট্রাল পুলিশ স্টেশনে। ব্যস—মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ এসে হাজির হবে।

নিজের নির্বুদ্ধিতায় অবাক হল ডি'সিলভা। সারা পৃথিবীতে ওর মতো কুখ্যাত টেররিস্ট আর পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। বছরের-পর-বছর ধরে উন্নততম প্রযুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এসেছে ও। বাঘা-বাঘা আন্তর্জাতিক গোয়েন্দারা ওকে ধরতে গিয়ে ল্যাজেগোবরে হয়েছে। আর আজ ও এত বড় বোকামি করে ফেলল।

হঠাৎ করে সামনের টেবিলে লাগানো ডিজিটাল মেনুকার্ড দেখে ও চমকে উঠল। তাতে ছোট করে লেখা—নো ক্যাশ পেমেন্ট অ্যালাউড। মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল। ছুটতে শুরু করল। নিশ্চয়ই ওয়েটারটা আগেই টের পেয়েছিল। তাই ক্যাশে দেওয়া যায়—এরকম মিথ্যে কথা বলেছিল। হয়তো এরকম প্রশ্ন পেলে এরকম উত্তরের জন্যই প্রোগ্রাম করা, যাতে পুলিশ ডাকা যায়।

ঠিক তাই। পিছনে একটা সাইরেনের আওয়াজ তাড়া করেছে, জোরে ছুটতে শুরু করে ডি'সিলভা। বড় রাস্তা এড়িয়ে পুরোনো কলকাতার সরু অলি-গলির মধ্যে দিয়ে জোরে ছুটতে থাকে। সামনে হঠাৎ করে কয়েকটা লোক এসে গিয়েছিল, ডি'সিলভা বাধ্য হয়ে একজনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে ছুটতে থাকল।

লোকগুলোও তাড়া করেছিল। কিন্তু ডি'সিলভার মতো কারও সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। খানিকক্ষণের মধ্যেই ওরা অনেক পিছিয়ে পড়ে

হাল ছেড়ে দিল। সাইরেনের আওয়াজটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। হাতে খানিকটা সময় আছে। দ্রুত ঋকের কার্ডটা বের করে রাস্তার ধারে ছুড়ে ফেলে দিল।

ওই কার্ডটা নিশ্চয়ই ট্র্যাক করা হচ্ছে। ওতে RFID চিপ লাগানো আছে। মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ ওই চিপে পড়লেই চিপের যাবতীয় তথ্য চলে যাবে পুলিশের সেন্ট্রাল সার্ভারে। অর্থাৎ সঙ্গে-সঙ্গে ওরা জানতে পারবে যে এটা ঋকের কার্ড। একইসঙ্গে স্যাটেলাইটের সাহায্যে ওরা জানতে পারবে যে ওই কার্ড ঠিক কোথায় আছে। ওকে তাই এখন তাড়াতাড়ি এই কার্ডটা থেকে দূরে যেতে হবে। ছুটে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না। দ্রুত হাঁটতে শুরু করে ডি'সিলভা।

একটা গাড়ি ভাড়া নিতে হবে। কাঁহাতক আর হেঁটে-হেঁটে পালিয়ে বেড়ানো যায়। কিন্তু উপায়? নিজের কার্ডে তো...

হঠাৎ করে কি একটা খেয়াল হতে ডি'সিলভার মুখে ক্রুর হাসি ফুটে ওঠে। আগে কেন এটা খেয়াল হয়নি?

কাছেই একটা কাররেন্টাল কোম্পানি আছে। আর ঠিক দুটো ব্লক পরে। নিজেই একটু অবাক হয় ডি'সিলভা। এসব রাস্তা তো ওর জানার কথা নয়।

আধমাইল পথ দ্রুত হেঁটে পৌঁছে যায়। 'A to Z কাররেন্টাল'। বাইরের কাউন্টারে একটা কমবয়েসি ছেলে বসে আছে। ডি'সিলভা ওর দিকে এগিয়ে যায়। হাতে ধরা পামটপের থেকে চোখ সরিয়ে ছেলেটা বলে ওঠে—ক'দিনের জন্য লাগবে?

তিন দিন।

আপনার কার্ড!

কার্ডটা স্ক্যান করে ছেলেটা বলে উঠল—আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স কিন্তু আর ছ'মাস বাদে এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে। খেয়াল রাখবেন। তা গাড়ি কোনটা নেবেন?

—যে-কোনও স্পোর্টস কার। একটু জোরে চালানো পছন্দ করি।

—ব্লু টোকোভা দিলাম। ঠিক পাশের গ্রীন গেটের সামনে যান। ওখানে আপনার গাড়ি WT236 ঠিক পাঁচমিনিট বাদে আপনার জন্য অপেক্ষা করবে। গাড়ির ইগনিশনে চাবি লাগানো থাকবে। আপনার কার্ডটা স্ক্যান করলে স্টার্ট হবে। কার্ডটা ফেরত নিয়ে ডি'সিলভা দ্রুত পাশের গেটের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ পিছন থেকে কাউন্টারের ছেলেটা ডেকে ওঠে—দাঁড়ান। আপনার একটা স্পেশাল সিকিউরিটি চেক হবে। কাউন্টারের ছেলেটা কাউন্টার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। পাশে একজন পুলিশ অফিসার।

—চেক, কেন?

—জানি না, আমাদের কাছে এখুনি মেসেজ এসেছে।

—অনেক সময় আসে।



—আপনার হাতের ছাপ আর রেটিনা স্ক্যান—গভীর দৃষ্টিতে ডি'সিলভার দিকে তাকিয়ে অফিসার বলে ওঠে। দু-মিনিট বাদে, টেস্ট রেজাল্ট দেখে বলে ওঠে—ওকে, থ্যাংকস ফর দ্য কোঅপারেশন।

ডি'সিলভা মুচকি হেসে কার পিক আপ গেটের দিকে এগোয়। ব্লু টোকোভা। ডি'সিলভার প্রিয় গাড়ি। রাস্তা ভালো থাকলে ষোলো সিলিন্ডার ইঞ্জিনে ভর করে আড়াইশো মাইল প্রতি ঘণ্টায় প্রায় উড়ে চলে।

গাড়িতে উঠে অ্যাড্রেস সিলেক্ট করে। কাছাকাছি কোনও একটা হোটেল। থানার পাশে হলে আরও ভালো। পুলিশ-থানার পাশেই যে অপরাধী লুকিয়ে থাকবে, এটা ওরা ভাবতে পারবে না। হোটেলটা নির্বাচন করে গা সিটে এলিয়ে দেয়। লোকের ওপর ভরসা না করা পেলেও, গাড়ির ওপর ভরসা করা যায়। কার্ডটা ইগনিশনের সুইচের সামনে ধরতেই গাড়ি স্টার্ট নেয়। তারপর ছুটে চলে উদ্দিষ্ট পথে।

॥ 19 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, রাত ন'টা ॥

—অনন্ত রঙ্গরাজন?—কার্ডটা স্ক্যান করে সুন্দরী রিসেপশনিস্ট বলে উঠল।

—হ্যাঁ, আমার তিন রাতের জন্য বুকিং লাগবে। আপনাদের স্যুইট-এর রেট কত?

—পার নাইট চল্লিশ হাজার টাকা, ট্যাক্স ইনক্লুড করে।

—গুড। দোতলা হলে বেটার হয়।

রিসেপশনিস্ট একটু অবাক হল। সবাই ওপরের দিকের ফ্লোর পছন্দ করে। দেড়শো তলার হোটেলের আসল সৌন্দর্যই তো ওপরের ভিউ।

—ওকে স্যার। ইউ হ্যাভ নাউ অ্যাকসেস টু রুম নাম্বার 209। আপনার কার্ডে চার্জ করে দিয়েছি।

কাঁধের ওপর কালো কোটটা ফেলে অনন্ত দ্রুতপায়ে লিফটের দিকে এগিয়ে যায়। সামান্য ট্যারা, চোখে রিমলেস চশমা। পাতলা সরু গোঁফ। নাকের সামনের দিকটা থ্যাবড়া মতো। দোতলায় উঠে গটগট করে রুম নাম্বার 209 এর সামনে এসে দাঁড়াল। মানিব্যাগটা দরজার সেনসরে স্ক্যান করতেই দরজা খুলে গেল।

ঢুকেই ড্রয়িংরুম। সঙ্গে একটা বেডরুম, বাথরুম। পেশাদারী চোখে চারদিক দেখে নিয়ে জুতো পরেই খাটের ওপর শুয়ে পড়ল অনন্ত। মুখে তৃপ্তির হাসি।

আবার পুলিশকে ফাঁকি দিতে পেরেছে ও। কয়েকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। ওর পরিচয় এখন ডি'সিলভা নয়। ও এখন অনন্ত রঙ্গরাজন। বয়স আটত্রিশ। শ্রীলঙ্কাবাসী ব্যবসায়ী। ক্লাস টু পর্যন্ত ওখানকার প্রাইভেট স্কুলে পড়াশুনো করেছে।

তারপরে বাড়ি থেকে প্রাইভেটে পড়ে কমার্স গ্র্যাজুয়েট। সারা পৃথিবীর আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি অনন্তকে স্বীকার করে নিয়েছে। তারা খোঁজ রাখে না যে সাঁইত্রিশ বছর আগেই অনন্ত প্রাণ হারিয়েছে 'এজমুল্লা' জঙ্গি সংগঠনের হাতে।

এ এক অভিনব উপায়। প্রথমে ক্লোন করে শিশু তৈরি করা। বাচ্চার ডিএনএ মার্কারের ওপর নির্ভর করে তার আইডেনটিটি কার্ড তৈরি করা। এই ডিএনএ মার্কার কখনওই দুজনের এক হতে পারে না। তাই এই মার্কারের ভিত্তিতে তাকে সরকারি রেকর্ডে নথিভুক্ত করা হয়। সরকার খুশি। সে ওই শিশুকে সারাজীবন আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারবে। কোনও দুষ্কর্ম করলেই পাকড়াতে পারবে। ইনসিওরেন্স কোম্পানি জানতে পারবে যে এই শিশুর কোনও দুরারোগ্য অসুখ আছে কি না। সেই অনুযায়ী সে ইনসিওরেন্স কভারেজ পাবে।

কিন্তু এসব কড়াকড়ি সত্ত্বেও ফাঁক আছে। সরকার তো আর দ্যাখে না যে ওই শিশুটা বেঁচে আছে কি না। ডি'সিলভার মতো টেররিস্টরা এটাই কাজে লাগায়। শিশুটাকে মেরে ফেলে তার আইডেনটিটি চুরি করে নেয়। বাচ্চাটার আর কোনও আত্মীয় না থাকায় কেউ খোঁজও করে না। একইভাবে খুন করা হয়েছিল অনন্তকে—এক বছরের শিশুকে! কথাটা মনে পড়তে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল ডি'সিলভার মুখে। ও অবশ্য নিজের হাতে মারেনি অনন্তকে। কারণ ওর বয়সও তখন ওরকমই ছিল।

তারপর থেকে মাঝেমধ্যে ও নিজেই অনন্ত হয়ে যায়। গভর্নমেন্ট জানে অনন্তও আছে, ডি'সিলভাও আছে। ডি'সিলভা টেররিস্ট আর অনন্ত মাঝারি মাপের ব্যবসায়ী, নির্ভেজাল ভালোমানুষ।

ডি'সিলভা নিজেই এরকম অনেক শিশু খুন করেছে। তবে ও সেটা করে পরবর্তী প্রজন্মের সন্ত্রাসবাদীদের জন্য, যাতে তারাও এই লুকোচুরির খেলা চালাতে পারে। নাকের ওপরে হাত বোলায় ডি'সিলভা। এটাই একটা অসুবিধে। ডি'সিলভা আর ঋকের মতো অনন্তও ঋষির ক্লোন। তাই প্রায় একরকম। কিন্তু পুরোপুরি এক হলেও মুশকিল। তাই ওর নাকটা ছোটবেলা থেকেই মোটা রাখা হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই তাই নিজের পরিচয় অনন্ত দেওয়ার সময় ওকে এই মেকআপ-টা করে নিতে হয়। এখন অবশ্য অভ্যেস হয়ে গেছে। মেকআপ কিট নিয়ে ঘুরতে হয় এই আর কী!

আরেকটা ছোট মেক আপ করতে হয়। বিশেষ ধরনের লেন্সের সাহায্যে চোখটা যাতে সামান্য ট্যারা দেখায় তার ব্যবস্থা করে নেয়। এজন্য ডি'সিলভার সঙ্গে চোখের মনি একদম এক হয়ে যায় না। কখনও-সখনও চোখের আইরিশ স্ক্যানও করা হয় লোক সনাক্ত করতে। তাই এই ব্যবস্থা। অনন্ত তাই আজও বেঁচে আছে।

অনন্তর নিজস্ব পরিচয় আছে, পছন্দ-অপছন্দ আছে, অন্য বন্ধু সার্কেল আছে। অনন্তর রেকর্ড অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। হুঁ, ওই ভুলটা করে না ডি'সিলভা। অনন্ত হয়ে যাওয়ার পরে সব থেকে বড় মেকআপ হল ওর মার্জিত ব্যবহার। ক্রিমিনাল পোশাকটা সরিয়ে ফেলে ও তখন একজন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ব্যবসায়ী। ব্যাবসার লাভের অংক ছাড়া যে আর কিছু বোঝে না।

এই দীর্ঘদিনের ডবলরোলের কথা ভেবে হেসে উঠল অনন্ত। শুধু একটাই আক্ষেপ। ওর অভিনয় ক্ষমতার জন্য বেশ কয়েকটা অস্কার পাওয়া উচিত ছিল। সেটা আর পাবে না।

তবে একটা জিনিস এখনও মাথায় ঢুকছে না। ও শ্রীলঙ্কা থেকে দুদিন আগে সুন্দরবন হয়ে ঢুকেছিল। পরিষ্কার মনে আছে তার আগের কথা। ভারতে আসার পর প্রথম দিনের কথাও মনে আছে। ম্যানগ্রোভ জঙ্গল, ছোট-ছোট খাড়ি। বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্সের চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতায় পৌঁছোনো। ও একটা ট্রেনেও উঠেছিল। বেশ ভীড় ছিল, অফিসের ভীড়। কিন্তু তারপরে? কমপ্লিট ব্ল্যাকআউট। সম্বিৎ যখন ফিরল তখন ও মধ্য কলকাতার একটা পার্কে। সামনে একজন মাটিতে পড়ে আছে। ও তাকে ভালো করেই চেনে। ঋক। প্রায় একবছর ধরে ঋককে ও চেনে, যদিও ঋক ওকে চেনে না। কমপ্লিট ডেটা সলিউশনসের উচ্চপদস্থ অফিসার ঋক।

এই সংস্থা সারা এশিয়ার সব ব্যাঙ্কের তথ্য রাখার দায়িত্বে। এখন আসলে দেশের ভাগটা প্রায় মুছে এসেছে। একই ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ সব দেশে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে লেনদেন বেড়েছে। দরকার হয়েছে একই নেটওয়ার্কে থাকার, তথ্য আদানপ্রদান করার।

সহজ সরল স্বভাব ঋকের। টেররিস্টদের সহজ টার্গেট। কিন্তু ঠিক কী কারণে ও ঋককে স্টাডি করছিল এই সোজাসাপটা কথাটা ওর মনে আসছিল না। তাড়াতাড়ি ও জায়গাটা ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু ঋকের কার্ড ওর কাছে এল কী করে? ঋকের আইডি কার্ড নিয়ে ওর লাভ কী? বিশেষ করে ঋককে যখন ও একেবারে মেরে ফেলেনি। নাহ্, একটু মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে হবে। হয়তো ঋককে শুধু অসুবিধেয় ফেলার জন্যই ও এটা করেছিল।

॥ 20 অক্টোবর, শুক্রবার, সকাল আটটা ॥

একশো বারো তলার এই ফ্ল্যাটটা থেকে বহুদূর অবধি দেখা যায়। আশেপাশে আরও এরকম উঁচু অনেক বাড়ি আছে। দূরে বেশ কয়েকটা উঁচু ব্রিজের কাজ হচ্ছে।

তবু আকাশের এত কাছে ভিড়টা একটু কম। নীচের রাস্তার লোকগুলোকে প্রায় দেখাই যায় না—এতটাই দূরত্ব। অবশ্য ঘরের ভেতরে যারা আছে, তাদের সঙ্গেও কি দূরত্ব কিছু কম? এখনও ছেলে-বউ-কে মাঝেমধ্যে কেমন যেন অচেনা লাগে ঋকের।

রোজকার অভ্যেস মতো সকালের খবরের কাগজটা নিয়ে বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে এসে বসেছে ঋক। পাশে ঋভুও আছে। ও আর মেলবোর্নে যায়নি। মনিও কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছে। আশা করা যায় কয়েকদিনের মধ্যেই এসব ঝামেলা মিটে যাবে। তখন ওরা ফিরে যাবে। নানান ঝামেলার মধ্যে এটাই একমাত্র ভালো দিক। বহুদিন বাদে ওরা সবাই একসঙ্গে। অন্য দিন শুধু একা ঋক আর রজনীশ থাকে। রজনীশ রোবট। একেবারেই গল্প করার মতো সঙ্গী নয়। শুধু চুপ করে সাহেবের কথা সবসময় শুনে যায়। খুব ভালো শ্রোতা। কোনও বিরক্তি নেই। কিন্তু কোনও প্রশ্নও করে না আগ বাড়িয়ে।

—কী, দুধ-চা, লেবু চা না ভিটামিন চা?

—দুধ-চা। বলে মনির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল ঋক। মনিও হেসে একটু লজ্জা পেয়ে কিচেনে ঢুকে গেল। প্রশ্নটা যে স্বাভাবিক নয় তা ওরা দুজনেই জানে। ঋক শুধু দুধ-চা-ই খায়। তাই মনি প্রশ্নটা করেছিল ঋকের সম্বন্ধে আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য। সন্দেহ থাকাটা স্বাভাবিক, সমাজটাই এখন এত জটিল হয়ে গেছে। কেউ কাউকে খুব ভালো করে চেনে না। চেনার মতো সময়ই পায় না।

ঋক ইচ্ছে করে মনিকে দেখিয়ে খবরের কাগজের শেষ পাতাটা দিয়ে পড়া শুরু করল। মনি জানে ঋকের কাগজ পড়ার অভ্যেসটা ভারী অদ্ভুত। মাঝের পাতা দিয়ে পড়া শুরু করে। মনি দেখে হেসে বলে ওঠে,—যাও আর মজা করতে হবে না, ঠিক করে পড়ো।

ঋকের পাশে বসে ঋভু একটা ছোট পামটপ দিয়ে খেলে যাচ্ছে। বাতাসে লেসার দিয়ে একটা কাক তৈরি হচ্ছে আর ও গুলি করে তাকে ভ্যানিশ করে দিচ্ছে। এসব খেলা দেখলে ঋকেরও খেলতে ইচ্ছে করে। নেশা হওয়ার ভয়ে খেলে না ঋক।

ঋভুর চুলগুলো খুব ঘন। ওর মাথায় হাত বোলাতে থাকে ঋক। অন্যদিন এ সুযোগ তো আসে না। ঋভুর চুলগুলো একজায়গায় জড়ো করে, আবার মুঠো আলগা করে দেয়। এ যেন অধিকার সত্ত্বেও অধিকার ছেঁড়ে দেওয়ার তৃপ্তি।

ঋভুকে এবার কাছাকাছি একটা স্কুলে ভরতি করে দেবে। অস্ট্রেলিয়া তিন ঘণ্টার পথ। কিন্তু ইমিগ্রেশান চেকিং, ও অন্যান্য নিয়মকানুনের প্যাচে পাঁচঘণ্টা লেগেই যায়। অফিসের পর আর যাওয়া হয় না। তার থেকে বাড়িতে রেখেই কাছাকাছি কোথাও পড়াবে। হোক না একটু খারাপ স্কুল। এই যে কাল রাত থেকে

ঋভু ওর সঙ্গে-সঙ্গে আছে, মনে হচ্ছে আর কিছু না হলেও চলবে। বড় মিস করে ঋভুকে।

—মনি, তোমার সঙ্গে ঋভুর ভাব হয়েছে তো? ঋভু, তোমার মার সঙ্গে কথা বলো।

মনি কাছে এসে বলে উঠল,—ঋভু সাহেবের তো সময়ই নেই। খেলা নিয়েই ব্যস্ত। তারপরে একটু থেমে ঋভুকে বলে উঠল,—ঋভু, চলো তোমার সঙ্গে লুডো খেলব।

—সেটা আবার কী?

—দেখবে, অনেক অনেক আগে লোকেরা লুডো খেলত। আমি সেদিন মিউজিয়ামে লুডো দেখে স্পেশালি অর্ডার দিয়ে তৈরি করেছি। তোমার জন্মদিনের জন্য। দাঁড়াও আনছি।

—তুমি পারো বটে মনি। কোথাকার আদ্যিকালের খেলা। তবে আমিও খেলব। বাবার মুখে শুনেছি ওরা ছোটবেলাতে খেলত। ছোটবেলাতে আমিও খেলেছি হয়তো। কে জানে! ছোটবেলার অনেক কিছুই আমার মনে পড়ে না।

ঋভু শেষ কাকটাকে গুলিতে উড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল,—আন্টি রেডি হলে বোলো।

—আন্টি নয়, মা। মা বলবে। বলে ঋভুকে বুকে জড়িয়ে ধরে ঋক। ছেলেটার জন্য ভারী কষ্ট হয় ঋকের। নিজের মাকে বড়জোর দুমাস কাছে পেয়েছিল ঋভু। সারিতা বাচ্চার বায়না-ঝক্কি সহ্য করতে পারত না বলে ওকে খুব ছোটবেলাতেই সিঙ্গাপুরে চাইল্ড কেয়ারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঋভু তাই রোবটদের সঙ্গ যতটা পেয়েছে, মা-বাবাকে ততটা কাছে পায়নি। এসব দিক থেকে ও নিজে অনেক লাকি। যখন ওর বয়স চার, মা কোথায় যেন চলে গেল। আজও জানে না ঋক। এখনও মনে পড়ে কাক-পাখি দেখিয়ে মা ঘুরে-ঘুরে খাওয়াত। বলত,—কে খাবে—পাখি না সোনা? আয় আয় পাখি। ওমা! কে খেয়ে নিল! ভারী দুষ্টু তো পাখিটা।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক কিছুই তো ফিকে হয়ে গেছে। মার ছবিটাও যেন এখন অন্যরকম লাগে। ছোটবেলার প্রায় কিছুই মনে পড়ে না ওর। ওর মেমারি খুব কম ছিল বলে অনেক চিকিৎসাও হয়েছে। যেটুকু মনে পড়ে, সময় পেলে সে কথাই ভাবে ঋক। আর যেন কিছু না হারিয়ে যায়।

শুধু সেদিনকার কথাটা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। ঘুমোচ্ছিল ঋক। রোজকার মতো অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর উঠে বসেছিল খাটে। ঘুমে প্রায় বুজে থাকা চোখের ফাঁক দিয়ে ভোরের আলোর আভাস ধরা দিচ্ছিল। অন্যদিনের মতো মা পাশে বসে মাথায় হাত বোলাচ্ছে। মাকে যেন সেদিন আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল।

অফিসের পোশাক পরা। গায়ে সুন্দর পারফিউমের গন্ধ।

—উঠে পড়ো সোনা। আমার অফিস যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। সেই কখন থেকে ডাকছি।

মাকে জড়িয়ে ধরে ও বলেছিল—না, আজ তুমি যেও না। প্লিজ। আমার তো আজ স্কুল ছুটি। তুমি সার্কাসে নিয়ে যাবে বলেছিলে!

—না সোনা, আজকে না। আজকে আমার খুব দরকারি কাজ আছে। আমি আজ চটপট করে কাজ শেষ করে, তাড়াতাড়ি চলে আসব। তারপর তোমাকে একটা সুন্দর গল্প বলে দেব।

—ঠিক তো? কালকে কিন্তু তুমি কথা দিয়ে কথা রাখোনি।

—ঠিক, ঠিক ঠিক। কালকে সূর্য ওঠার আগে তোমাকে একটা গল্প বলবই। বাঘ-শেয়ালের গল্প।—মা হাসতে-হাসতে বলেছিল।

ভারী খুশি হয়ে মাকে চুমু দিয়ে বিদায় জানিয়েছিল ঋক।

মা কিন্তু কথা রাখেনি। কথা রাখতে পারেনি। পরের দিন সদ্য ফোটা ভোরের আলোয় ফুল দিয়ে সাজানো কাপড়ে মোড়া দেহটাকে দেখিয়ে কাজের মাসি কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিল—তোমার মা আর নেই।

ঋক তাই জানে সবসময় কথা রাখা যায় না। সময় প্রতিমুহূর্তে রং বদলায়। আর সেই বদলানো সময়ের চেহারা কি হবে তা ভেবে বর্তমানকে অবহেলা করা চলে না।

ঋভুকে আবার জড়িয়ে ধরে বেশ খানিকক্ষণ আদর করে ঋক। বলে ওঠে—গল্প শুনবে সোনা? বাঘ-শেয়ালের?

—শেয়াল—সে আবার কি?

॥ 20 অক্টোবর, শুক্রবার, সকাল দশটা ॥

—আমি ইউরোপিয়ান ইনটেলিজেন্স ব্যুরো থেকে জন বলছি।

ভিডিওফোনে জনের ছবি ফুটে উঠল। জনের আইডি কার্ড ভ্যালিডেট করে স্ক্রিনে দেখিয়ে দিল ভিডিওফোন। আইজি ইউরোপিয়ান ইনটেলিজেন্স ব্যুরো।

—বলুন। আমি মিঃ দাস। ডিরেক্টর জেনারেল এশিয়া আই-বি।

—মর্নিং, আমি ডি'সিলভার ব্যাপারে ফোন করেছিলাম। ও তো এখনও ইন্ডিয়াতেই আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, আমাদের খবর অনুসারে ইন্ডিয়াতেই আছে। কিন্তু ওর সঙ্গে কোনও আইডি কার্ড নেই বলে ট্র্যাক করা যাচ্ছে না। ও যার আইডি কার্ড চুরি করে

পালিয়েছিল, সে লোকটাকে ভারতের ইস্টার্ন জোনের একটা পুলিশ স্টেশনে ধরে আনা হয়েছিল। তাকেও ট্র্যাক করা হচ্ছে। তার নাম ঋক, কমপ্লিট ডেটা সলিউশনসের একজন বড় অফিসার।

—সেসব ইনফরমেশন আমরাও পেয়েছি, তা আপনারা ঋকের হারানো আইডি ট্র্যাক করছেন নিশ্চয়ই।

—করছিলাম। কাল ওই আইডিটা কলকাতার এয়ারপোর্টের কাছাকাছি এক জায়গায় পেয়েছি। ডি'সিলভা খুব সম্ভবত ওটা ফেলে কাছাকাছি কোনও ছোট শহরে পালিয়ে গেছে। তবে কার্ড না থাকলে শহর থেকে বেরোবেই বা কী করে? তা ছাড়া ওর মতো দেখতে কাউকে দেখলেই ধরা হচ্ছে। কার্ড ছাড়া তো ও না পারবে কোথাও যেতে, না পারবে বাস-ট্রেন-প্লেনে উঠতে!

—দেখুন, ডি'সিলভার মতো দেখতে যে ক'জন ক্লোন এশিয়াতে আছে সবাইকে ট্র্যাক করুন। লোকটা সাংঘাতিক ইনটেলিজেন্ট। কথার উচ্চারণ, ভয়েস এসব এমন তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করতে পারে যে ভয়েস রেকগনিশন যন্ত্র দিয়েও ধরা যায় না। যাকে ইচ্ছে নকল করতে পারে। তবে চোখের মনির একটা ছবি ধরা পড়ে গিয়েছিল, যখন ও ইউরোপের শেয়ার মার্কেট ধসিয়ে দিয়েছিল।

—কিন্তু সে তো অন্য লোক। বিল রুপেল। সে তো মারাত্মক ঘটনা। শেয়ার মার্কেটের নেটওয়ার্কে ঢুকে কয়েকঘণ্টা কোনওরকম শেয়ার কেনা বন্ধ করে দিয়েছিল। কেউ কিনছে না দেখে ভয় পেয়ে সবাই বিক্রি করতে শুরু করে দিয়েছিল। মার্কেট আধঘন্টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়।

—বিল রুপেল আর ডি'সিলভা একই লোক। একে আমরা, আমেরিকান ইনটেলিজেন্স ব্যুরো—সবাই খুঁজছি। কুখ্যাত টেররিস্ট। ধরতে পারলে আপনি একেবারে ফেমাস হয়ে যাবেন। লোকে বলবে, সারা বিশ্ব যা করতে পারেনি, এশিয়া তা করে দেখাল।

একটু থেমে জন ফের বলে ওঠে,—লস অ্যাঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে চারমাস আগে একঘণ্টার মধ্যে যে বারোটা বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছিল তাতেও এরই হাত। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের নেটওয়ার্কে ঢুকে বিভিন্ন বিমানে ভুল সঙ্কেত পাঠিয়ে দিয়েছিল। যে বিমানের হয়তো কুড়িহাজার ফুট ওপরে থাকার কথা, তাকে ইচ্ছে করে দশহাজারে নামিয়ে দিয়েছিল। জাস্ট একঘণ্টার মধ্যে বারোটা বিমান অ্যাক্সিডেন্ট! ভাবতে পারেন?

—ও তাতেও এর হাত ছিল বলছেন?

—বলছি মানে? একদম নিশ্চিত। খুব ডেঞ্জারাস লোক। আমরা ওর নাড়ি-নক্ষত্র জেনেও কিছু করতে পারছি না। মিডল ইস্টের বড় একটা অংশের সাপোর্ট পায়। আমি আপনাকে ওর সম্পর্কে কয়েকটা জিনিস বলে রাখি। প্রথমত ও

কলকাতাতেই থাকবে। কারণ যা-ই করতে আসুক না কেন, তা বড় শহরে নিশ্চয়ই সহজে করা সম্ভব। দু-নম্বর লোকটা নিজে ইঞ্জিনিয়ার। টেকনোলোজি খুব ভালো বোঝে। ফোন ব্যবহার করে না। আরেকটা কথা, যতবার ওকে কোনও দুষ্কর্ম করতে দেখা গেছে সবসময়ই দেখা গেছে ওর মতোই দেখতে একটা লোক সেসময় ওই শহরেই ছিল। ইনসিডেন্টালি এবারও ওই লোকটা কলকাতাতেই আছে। নাম অনন্ত। আমি ওর কার্ড ডিটেলস পাঠিয়ে দেব। ওকে ট্র্যাক করুন।

—অনেক ধন্যবাদ। এখনই ট্র্যাকিং শুরু করছি।

—আরেকটা জিনিস। ঋককে কিন্তু ছাড়বেন না, যতক্ষণ না ডি'সিলভা ধরা পড়ছে। আপনি তো ওর আইডি কার্ড পেয়ে গেছেন বললেন। নিশ্চয়ই ঋকের রক্ত নিয়ে তুলনা করতে দিয়েছেন যে ওটা ওরই কার্ড কি না! মিলে গেলেই নিশ্চিন্ত হবেন যে ওই ঋক।

—হ্যাঁ, সে তো করছিই। তবে আরও কয়েকঘণ্টা লাগবে।

—ওকে, বাই ফর নাউ। কী হচ্ছে না হচ্ছে তা আমাদের জানাবেন প্লিজ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। সার্টেনলি। বলে ফোনটা কেটে দিলেন মিঃ দাস। একটু বিরক্তির সুরে পাশে বসা আরেক অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,—শুধু জ্ঞান দেওয়া, তোরা যখন পারিসনি তখন আমাদের ওপরই ছেড়ে দে! একটু থেমে ফের বললেন,—কোনও ইনফরমেশন শেয়ার করবে না। ওরা ক্রেডিট নিয়ে নেবে।

॥ 20 অক্টোবর, শুক্রবার, সকাল দশটা ॥

ভোরের আলো পরদার সামান্য ফাঁক দিয়ে এসে বিছানার ওপর চিত হয়ে পড়েছে। একটু এপাশ ওপাশ করে খাটের ওপর উঠে বসল ডি'সিলভা। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। বেড সাইড টেবিলে লাগানো ডিজিটাল মেনুকার্ডে চা আর টোস্ট সিলেক্ট করে আবার শুয়ে পড়ল। একটু ভাবা দরকার। এবারের মিশনটা কী? ভারতে কী জন্য আসা? ইউরেনিয়াম জোগাড় করা, না কী কোনও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটানো? প্লেন ক্র্যাশ? শপিং মলে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দেওয়া?—ঠিক যেমন গতবছর মেক্সিকোতে করেছিল। সব থেকে বড় শপিংমলের এসি ডাক্টের মধ্যে বিষাক্ত সারিন গ্যাস ছড়িয়ে দিয়েছিল। বহু লোক মারা গিয়েছিল। বোঝার আগেই আবদ্ধ বাতাসে প্রাণ হারিয়েছিল অনেকে। বাচ্চা-জোয়ান-বুড়ো কেউ বাদ যায়নি।

কোনওদিন কোনও কাজে ব্যর্থ হয়নি ডি'সিলভা। কিন্তু এবার যেন কী হয়েছে! শুধু মনে হচ্ছে এবার যেন আরও বড় কিছু একটা করার কথা ভাবা

হয়েছিল। যদি ঠিকভাবে করা যায় তা হলে পুরো মানব সভ্যতার ভিত নড়িয়ে দেওয়া যাবে। বিজ্ঞান-শিক্ষা-উন্নয়নের নোংরা পোশাক খুলে পরিয়ে দেওয়া যাবে ধর্মের বিধি নিষেধ। ফের ফিরে আসবে মধ্যযুগীয় আইনকানুন। সেটাই তো চাই। উন্নয়নের বাঁদর নাচ নেচে কার কি লাভ হয়েছে?

ঠিক এই সময় কলিংবেল বেজে উঠল। ব্রেকফাস্ট এসে গেছে। দরজা না খুলে সুইচ টিপে বাইরের ট্রে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল ও। চট করে বাথরুম সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে টেবিলে এসে বসল ডি'সিলভা। ব্যাগটা একটু ঘেঁটে দেখা দরকার। যদি কোনও ক্লু থাকে! ছোট ব্যাগ কোটের মধ্যে লুকোনো থাকে। কিন্তু ব্যাগ ঘেঁটে-ঘুটে কিছুই পেল না ও।

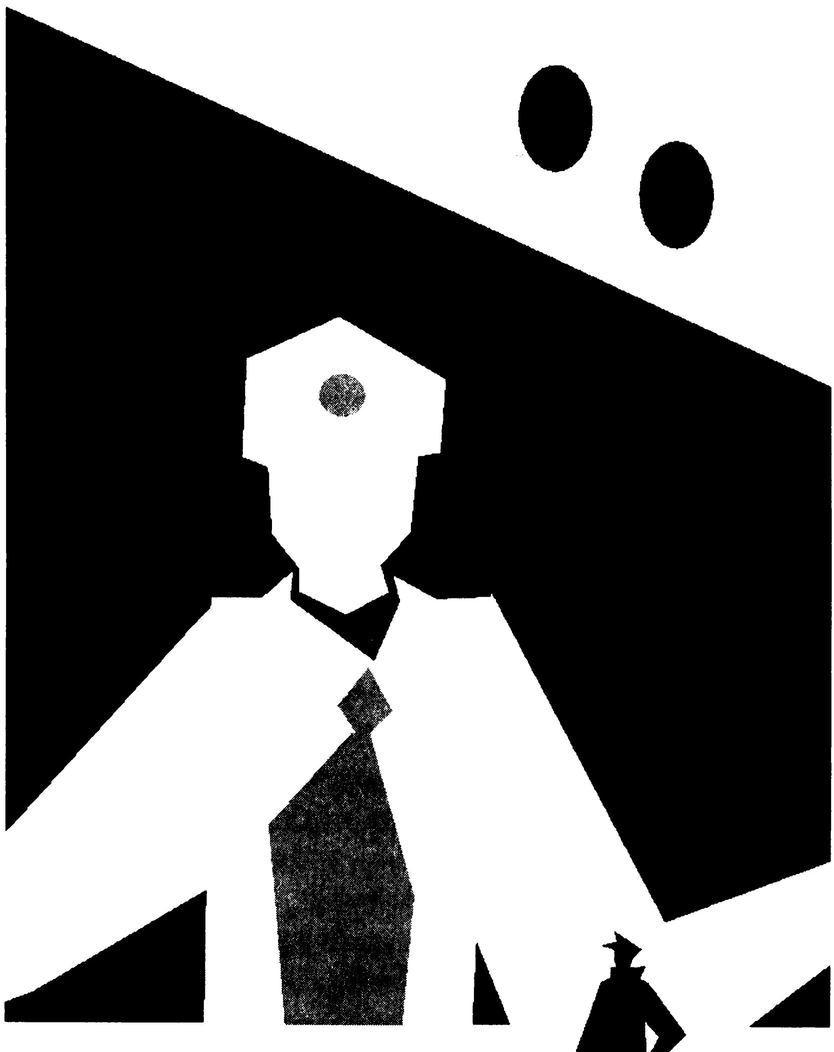
ফোন করবে? ওদের অর্গানাইজেশন-এর প্রধান ইসমাইলকে? ও তো জানবেই। না, এতটা রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে না। হোটেলের ফোন ট্যাপ করা থাকতে পারে। ফোন ট্যাপ করা না থাকলেও আজকাল জানলার কাচের ওপর লেসার ফেলে কম্পন দেখে ঘরের ভেতরে কী কথা হচ্ছে তা বের করা যায়। তার থেকে একবার বাইরে ঘুরে আসা যাক। ঠিক বোঝা যাবে ওর ওপর কেউ লক্ষ্য রাখছে কি না।

যেই ভাবা সেই কাজ। রুমেই আছে দু-মিনিটে কাচা, শুকনো, ইস্তিরি—সককিছু একসঙ্গে করার যন্ত্র। চট করে টিশার্টটা ওতে ঢুকিয়ে ইস্তিরি করে গায়ে গলিয়ে নিল। আরেকটা কিনতে হবে। এটা পরেই ঘুরছে সমানে।

হাতের গ্লাভসটা ঠিকমতো আছে কি না দেখে নিল। এই দস্তানাটা কিছুতেই বাইরে থেকে বোঝা যায় না। অথচ এর জন্যই সব আঙুলের ছাপ অনন্তর মতো আসে। ডি'সিলভার মতো নয়। বলা যায় না! আইডি কার্ডের বাইরেও তো আইডেনটিফাই করার জন্য অন্য ব্যবস্থা থাকতে পারে। পরে হয়তো ঘরের সব আঙুলের ছাপই মিলিয়ে দেখা হল যে তা ডি'সিলভার সঙ্গে মিলছে কি না। তখনই ও ধরা পড়ে যাবে।

হোটেলের ঘরের দরজা খোলা রেখেই ও করিডরে পা বাড়াল। যাতে কারো সন্দেহ না হয় তাই হাঁটাচলার মধ্যে একটা বেশ কেয়ার ফ্রি ভাব। এদিক-ওদিক দু-একটা মুচকি হাসি—অলস চাউনি—মনে হয় যেন ছুটি কাটাতে এসেছে। হোটেলের উলটো দিকেই একটা শপিং মল। রাস্তা পার হয়ে শপিং মলে গিয়ে ঢুকল। ঢোকার জায়গাতেই আঙুলের ছাপ নেওয়া হচ্ছে। যে-ই ঢুকছে তার দু-হাতের সবক'টা আঙুলের ছাপ তার আইডির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

এই বাড়াবাড়ি সতর্কতা যে ওরই জন্য তা ভালোই জানে ও। ঢোকার সময় হঠাৎ করে মেঝেতে পিছলে যাওয়ার একটা সূক্ষ্ম অভিনয় করল। এভাবে, সামান্য অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে স্ক্যানারে হাতের আঙুলের ছাপ দিয়ে দিল। 'ভ্যালিড



ম্যাচ'। অনন্তর আইডির সঙ্গে। সিকিওরিটি মলে অভ্যর্থনা করল। অবশ্য খুব সজাগ থাকলেও যে, হাতে পরা দস্তানাটা খেয়াল করত না এ বিষয়ে ও নিশ্চিত। তবু যতটা সাবধান হওয়া যায়।

অনন্তর রেকর্ড খুব ভালো। কখনও কোনও গন্ডগোলে পড়েনি অনন্ত। কখনও বেআইনি কিছু করেনি। এ সবই রেকর্ডেড থাকে আইডি কার্ডে। বাজে ব্যবহার করলে, কাউকে গালাগাল দিলে, কোনও নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙলে সঙ্গে-সঙ্গে তা রেকর্ড খারাপ করে দেয়। এভাবে একজনের রেটিং সমানে পরিবর্তিত হয়। বাড়ে-কমে। যার রেটিং যত ভালো সে তত বেশি আদর-যত্ন-খাতির পায়। অনন্ত যে-কোনও দোকানে স্পেশাল লাইনে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়। সেখানে ভীড় কম—সাহায্য করে সুন্দরী রোবটরা। এ ছাড়া অনেক হাই সিকিউরিটি জোনেও সহজে যেতে পারে। সহজে খেলার ম্যাচের টিকিট পায়। রেকর্ড অনুযায়ী ভালো হওয়ার অনেক লাভ।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ঘুরতে থাকে ডি'সিলভা। শুধু একটা সূত্র পেলেই ও সেরকমভাবে কাজ শুরু করতে পারে। হলের মধ্যে 'ভিকট্রি ফর আস' ব্র্যান্ডের কিছু প্রমোশন হচ্ছে। বেশ কিছু মডেল ওই ব্র্যান্ডের পোশাক পরে মলের মধ্যে ঘুর বেড়াচ্ছে। ছেলেদের জামাকাপড়ের নামকরা ব্র্যান্ড। কমবয়সিদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। ডি'সিলভাও এদেরই শার্ট-গেঞ্জি অনেকসময় পরে। এখনও ওই ব্র্যান্ডেরই টি-শার্ট পরে আছে। হঠাৎ সামনের কাচের লিফটে নিজেকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালো ও। ওর টি-শার্টও একই ব্রান্ডের। টি শার্টে কোম্পানির লোগো 'VICTORY FOR US"। কিন্তু কিছু-কিছু অক্ষর অন্যগুলোর তুলনায় অস্পষ্ট। অস্পষ্ট অক্ষরগুলো হল 'V', 'I', 'R', 'U', 'S'—ভাইরাস?

তবে কি? পুরো ব্যাপারটা মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল। ওর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও ডেঞ্জারাস ভাইরাস আছে। ও এই ভাইরাসের ক্যারিয়ার। অর্থাৎ ওর কাছাকাছি কেউ এলেই ওই ভাইরাসে সংক্রামিত হবে। অথচ ওরকিছু হবে না। আর সেটাই ওর মিশন। এখন ওর কাজ যতসম্ভব জনবহুল জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়ানো—যাতে এই দুরারোগ্য অসুখ ছড়িয়ে পড়ে। আর তার ওষুধ বেরোনোর আগেই লক্ষ-লক্ষ লোক মারা যায়। ভয়ে লোকে রাস্তাঘাটে না বেরোয়। ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে ওঠে। সভ্যতা থমকে দাঁড়ায়। একটা ওষুধ বের করতে কয়েক বছর লেগে যাবে। ততক্ষণে উঠোন ফাঁকা।

ওকে নিজে থেকে কিছুই করতে হবে না। এজন্যই নিশ্চয়ই কোনওভাবে এই পরিকল্পনার কথা ওকে জানানো হয়নি—বা জানানো হলেও ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীসের ভাইরাস? দুটো জিনিস নিশ্চিত। এক, ভাইরাসটা নিশ্চয়ই

খুব সহজে ছড়িয়ে যায়। দুই, এমন ভাবে একে তৈরি করা হয়েছে যাতে চট করে তার কোনও ওষুধ না বেরোয়। তবে ওকে নিশ্চয়ই এর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। তাই ওর এখনও কোনও অসুখ হয়নি। অসুখটা কী জানতে পারলে আরেকটু আনন্দ হত।

সামনে দিয়ে স্কুলের বাচ্চাদের একটা দল হেঁটে যাচ্ছিল, সঙ্গে টিচার আছে। মলের উপরদিকে একটা চিড়িয়াখানা আছে। সেখানেই হয়তো স্কুল থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ভালো কাজ ওদেরকে দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। মৃদু হেসে ওই গ্রুপটার দিকে হেঁটে গেল ডি'সিলভা। বলে উঠল,—বয়েজ, হুইচ স্কুল আর ইউ ফ্রম?

॥ 20 অক্টোবর, শুক্রবার, রাত আটটা ॥

—ডি'সিলভা ঠিক কি চায় বলো তো? কোনও কাজ নেই—শুধু কীভাবে কোথায় গণ্ডগোল পাকানো যায়! লোককে মেরে যে ওরা কি আনন্দ পায়! চা-এ চুমুক দিতে-দিতে ঋক বলে ওঠে।

—তোমার তো ডি'সিলভাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। বহুদিন বাদে বাড়িতে বসে নিশ্চিন্তে ছুটি কাটাতে পারছ। আমি এসেছি, ঋভু এসেছে। তাছাড়া সারা শহর তোমাকে এখন চেনে। তুমি তো রীতিমতো সেলিব্রিটি!

—হ্যাঁ, যা বলেছ! আজ অনেকগুলো টিভি চ্যানেল থেকে ফোন করেছিল। কিছু বলা বারণ বলে ফোন কেটে দিয়েছি। তা ডি'সিলভা তো আবার তোমার দেশের লোক। শ্রীলঙ্কার। দ্যাখো তোমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছে কি না!

—ছাড়ো তো ইয়ার্কি! তবে হ্যাঁ, একদিনের জন্য এরকম বিশ্রাম আমারও ভালো লাগছে। একটু থেকে মনি বলে ওঠে,—'ও তোমাকে বলা হয়নি। আমি যে ওষুধটার কথা তোমাকে বলতাম—ওটা শেষ পর্যন্ত সব টেস্ট পাস করেছে। নানান ধরনের লোকের ওপর ওষুধটা প্রয়োগ করা হয়েছিল। কোন সাইড এফেক্ট নেই। চারটে অসুস্থ বাচ্চার ওপর পরীক্ষা চলছিল। তারাও একেবারে সেরে উঠেছে।

কীসের ওষুধ? প্রোজেরিয়ার?

হ্যাঁ, প্রোজেরিয়ার। ভারী কষ্ট হয় বাচ্চাগুলোকে দেখলে। এইটুকু বাচ্চা—কোথায় জীবনটা হেসে-খেলে-মজায় কাটাবে, তা না, রোজ মৃত্যুর দিন গুনছে। কত নিঃসঙ্গ ওরা। পরিবারের কেউ খোঁজও রাখে না।

একটু থেমে ছলছল চোখে মনিদীপা বলে ওঠে—সবার যদি এ অসুখ হত, তাহলেই বোধহয় ভালো হত। এদেরকে আমরা এরকম ঘৃণার চোখে দেখতাম না।

আলাদা করে দিতাম না। জীবন বলতে তো ওদের প্রাপ্তি মোট দশ-বারো বছর। তাও সেটা যদি স্বাভাবিক হত।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে মিসেস প্রোজেরিয়া। দয়া করে আজ আর অসুখের কথা নয়। তা তুমি পাকাপাকি কলকাতায় আসছ কবে?

—আসতে চাইলেই কি আর আসা যায়! তাছাড়া এ প্রোজেক্টটা শেষ না হলে আমি নিজেই আসতে চাই না। তাও তো সপ্তাহে একদিন ইচ্ছে করলে আসা যায়। ভাবো তো, যারা মঙ্গলে কাজ করে! বছরে একবার আসতে পারে কি না সন্দেহ!

ঘরের এককোনে ঝন করে আওয়াজ হল। কাচের গ্লাস ভাঙার শব্দ। ঋভুর হাত থেকে দুধের গ্লাস পড়ে ভেঙে গেছে।

রজনীশ হতভম্ব হয়ে ছুটে গিয়ে চোখ গোল করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কাছে এ ঘটনাটা একেবারেই নতুন। কখনও এঘরে কিছু ভাঙেনি। আসল কোনও কিছু ভাঙার মতো লোকই নেই।

ঋক উঠে গিয়ে আস্তে করে ঋভুকে সরিয়ে নিয়ে এল। ওর বেশ ভালোই লাগল। জিনিসপত্র না ভাঙলে কি আর বাড়িতে বাচ্চা আছে বলে মনে হয়!

ঠিক এসময় মনিদীপার ফোনটা বেজে উঠল।

—হোয়াট! বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না? কেন? আগে তো বলেছিলেন যে অফিস আর কোনও হাই সিকিওরিটি জোন ছাড়া অন্য জায়গায় যাওয়া যাবে। কাগজ পত্রও তো সই করে দিলাম।

উলটোদিকে কে কথা বলছে না শুনতে পেলেও ঋক বুঝতে পারল যে এটা থানা থেকে ওর জন্যই ফোন। এখন তাহলে ঘরের বাইরে যাওয়া বন্ধ। পুরোপুরি গৃহবন্দি। মনির গলার পারা আরও উঠছে—দেখুন, টেস্ট রেজাল্ট পাওয়া যায়নি বলে তো আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন না। আমিও বলে রাখছি। আমার নাম মনিদীপা বোস। কালকেও যদি ওকে ঘরে আটকে থাকতে হয় তো আমি হিউম্যান রাইট্‌সে যাব। দেখি আপনি কি করেন! আপনাকে না থানায় আটকে থাকতে হয়!

॥ 21 অক্টোবর, দুপুর একটা ॥

তদন্তের রিপোর্টটা ডঃ রায়বর্ধন ব্রায়ানের দিকে এগিয়ে দিলেন।

—আমি শিওর ঘটনাস্থলে আরও একজন ছিলো। ঋক, ডি'সিলভা ছাড়াও অন্য কেউ। আরেকজনের পায়ের ছাপ, ডিএনএ পাওয়া গেছে।

—তা এরকম একটা পাবলিক পার্ক বেছে নেওয়া হল কেন বুঝতে পেরেছেন?

—এটা অফিসপাড়ায়। অফিসের দিন দুপুরবেলা কেউ এখানে যায় না। তা ছাড়া কিছু একটা কারণে পার্কের চারদিকে ছড়িয়ে রাখা ক্যামেরাগুলোও কাজ করেনি। মনে হয় আগে থেকেই কেউ ব্যবস্থা করে রেখেছিল, যেন ওই জায়গার ক্যামেরাগুলো কাজ না করে।

—অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ঋকের আইডি সরানো হয়েছে বলছেন?

—হ্যাঁ, আরেকটা খটকা আছে। এটা সরাতে দু-মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা নয়। সেখানে ওরা কিন্তু কুড়ি মিনিট মতো ছিল।

—আশ্চর্য।

—আর তা ছাড়া ডি'সিলভার পাস্ট অপারেশনগুলো লক্ষ করুন। কোনওটাই ও খুব সহজ সরল ভাবে করে না। আর এখানে দুয়ে-দুয়ে চার যেন বড় সহজেই মিলে যাচ্ছে। প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা কিছু মিস করছি না তো?

—ঠিক বলেছেন। আচ্ছা ঋকের ডিএনএ টেস্টিং রেজাল্ট পেয়ে গেছেন?

—হ্যাঁ, এই খানিকক্ষণ হল পেয়েছি। তবে ওর আগের আইডি কার্ডের সঙ্গে ম্যাচ করা মুশকিল হয়ে গেছে।

—কেন?

—ডি'সিলভা ওটা ফেলে দেওয়ার আগে ড্যামেজ করেছিল। কার্ডের অন্যান্য রেকর্ডগুলো ঠিক আছে। কিন্তু জেনেটিক মার্কারের সংক্রান্ত রেকর্ডগুলো পুরো পড়া যাচ্ছে না। তবে যেটুকু দেখেছি, ম্যাচ করছে ঋকের রক্তের মার্কারের সঙ্গে। ডঃ রায়বর্ধন বলে ওঠেন।

—দেখবেন এ কথাটা ছড়িয়ে না যায়। এমনিতেই ওকে ছাড়ানোর জন্য নানান লেভেল থেকে প্রেশার আসছে। লোকটা বেশ বড়সড়ো অফিসার। ওদের আঞ্চলিক অধিকর্তা। অফিসের নানান ধরনের কাজ নাকি ওর অবর্তমানে আটকে যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত বাড়ির বাইরে কোথাও যেতে দিইনি। লোকটার স্ত্রী—তারও ভালো কানেকশন আছে। সে-ও দু-বেলা ফোন করছে। খুব জাঁদরেল মহিলা। কথায়-কথায় আমাকে হিউম্যান রাইটস দেখায়।

—তা আপনি ওকে পুরোপুরি ছাড়ার কথা কবে ভাবছেন?

—আগে ডি'সিলভা ধরা পড়ুক, তবেই ওকে ছাড়া। ভালোই তো আছে। আমি তো এরকম অবস্থায় পড়লে খুশিই হতাম। বাড়িতে ছেলে-বউ-এর সঙ্গে বসে যত ইচ্ছে আড্ডা মারো, যা ইচ্ছে খাও। টোটাল রেস্ট। নো টেনশন। কতবছর হয়নি। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অফিসার ব্রায়ান।

চারবছর হল ওনার একমাত্র ছেলেকে দ্যাখেননি। পড়াশুনোয় খুব ভালো

ছিল। স্পেস সায়েন্সে মাস্টার্স করার পর মঙ্গলে চলে গেল। ওখানে কৃত্রিমভাবে মানবকলোনি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। বিশাল-বিশাল গ্রিন হাউসের মধ্যে পৃথিবীর মতো জলবায়ু তৈরি করার কাজ হচ্ছে। ওকে শেষবার ফোন করেছিলেন একমাস আগে। জিগ্যেস করেছিলেন কবে ফিরতে পারবে। উত্তর পেয়েছিলেন আরও নাকি দশ-বারো বছর লেগে যাবে। আসলে ও আর ফিরবে না। বাবা-মার প্রতি ওর কোনও আকর্ষণই নেই। হবে-ই বা কেন? ছোটবেলা থেকেই অন্য মহাদেশে পড়াশুনো করেছে। বাবা-মায়ের সঙ্গ তেমন কোনও সময়ই পায়নি।

এসব কথা ভেবে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন ব্রায়ান। স্ক্রিনে ইনস্পেক্টর ডি'সুজার ছবি ফুটে উঠল।

—স্যার, আমরা অনন্তকে সমানে ট্র্যাক করছি। কিন্তু হাতের ছাপ বা চোখের মনির ছবি কোনটাই ডি'সিলভার সঙ্গে মেলেনি।

—তা সেক্ষেত্রে আর ট্র্যাক করে লাভ কী? অন্য যাদের এরকম দেখতে তাদের উপর ফোকাস করো। দেখো তাদের মধ্যে কারও ডি'সিলভার চোখের মণির সঙ্গে মেলে কি না।

—সেটাও আমরা করেছি স্যার। তবে সবক্ষেত্রেই রেজাল্ট আপাতত নেগেটিভ। মেলেনি।

—টেস্টে কোনও গোলমাল হচ্ছে না তো?

—না, না, ভুল হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। কাছাকাছি হলেও আমরা ধরতাম। কোনওরকম চেষ্টাই বাদ রাখিনি আমরা। সবক'টা মলে, রেস্টুরেন্টে, হোটেলে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, পোর্টে আইডি কার্ডের বাইরেও হাতের ছাপ নেওয়া আবশ্যিক করে দেওয়া হয়েছে। অনেক জায়গায় এর জন্য অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। লোকেরা বারবার করে হাতের ছাপ দিতে-দিতে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। সব কিছুতে সময় অনেক বেশি লাগছে। জাস্ট কয়েকদিনের জন্য বলে কোনওরকমে সামলাচ্ছি। সব জায়গায় কৃত্রিম মাছি ছড়িয়ে দিয়েছি। ডি'সিলভার মতো লোক দেখলেই ক্যামেরার সাহায্যে চোখের মনির ছবি সুযোগ মতো তুলে আমাদের ডেটাবেসে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমরা মিলিয়ে দেখছি। পুরো পুলিশ ফোর্স এসব করতে গিয়ে আর বাকি কাজের সময় পাচ্ছে না।

—তা এর থেকে বড় কাজ আর কী? এত বড় জলজ্যান্ত টেররিস্ট চোখের সামনে ঘুরছে। ওপরওয়ালা তো বলেই দিয়েছে আর কয়েকদিনের মধ্যে ধরতে না পারলে আমাকে অস্ট্রেলিয়ায় ট্রান্সফার করে দেবে। বুড়ো বয়সে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে গিয়ে মরি আর কী!

—স্যার, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম। অনন্তর ব্যাপারে। অন্য কিছু না মিললেও ইউরোপ থেকে আপনি যা-যা পয়েন্টার পেয়েছিলেন তার বেশ কিছু

মিলে গেছে।

—ইন্টারেস্টিং, কীরকম?

—লোকটা একই জামা-প্যান্ট সমানে পরে। নানান দোকানের সামনে দিয়ে জোরে হেঁটে যেতে-যেতে হঠাৎ করে কোনও একটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর ওই দোকানে ঢোকার আগে নাকে একবার হাত বুলিয়ে নেয়। যেন কিছু একটা ভেবে নেয়। তারপর ঢোকে।

—এক্সসেলেন্ট। আর?

—মাঝে-মাঝে নীচু হয়ে মোজাটা ফের টানটান করে পরে। ঠিক যেমন ওরা বলেছিল। তবে সব যে মিলছে তাও নয়। যেমন বলা হয়েছিল ডি'সিলভা নাকি মুখচোরা—কারুর সঙ্গে সেধে কথা বলে না। এখানে দেখি উলটো। অনন্ত সবার সঙ্গে মিশতে ভালোবাসে। ডেকে-ডেকে আলাপ করে। বাচ্চাদের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি মিশে যায়। যেখানেই যায় বন্ধু জোগাড় করে ফেলে। আমার সঙ্গেও আলাপ করতে এসেছিল। জিগ্যেস করছিল কী করি ইত্যাদি। কীরকম টাকাকড়ি পাই।

—আর তুমিও গদগদ হয়ে বলে ফেলেছ যে তুমি পুলিশের লোক। ডি'সিলভাকে খুঁজছ। তাই তো?

—না বলিনি। ও-ই বলল ডি'সিলভা কি আর এতদিন কলকাতাতে পড়ে থাকবে। কী করে জানল কে জানে?

—ডি'সিলভা বলেছে? তুমি শিওর?

—হ্যাঁ, হান্ড্রেড পার্সেন্ট।

—আর সেটা এত কথার পরে বলছ? ইমিডিয়েটলি গেট হিম ডেড অর অ্যালাইভ। হি ইজ ডি'সিলভা। আমরা খবরে কী দেখাচ্ছি—দ্যাখোনি? একজন বড় ক্রিমিনাল ডি'সিনহা বাংলাদেশ থেকে কলকাতাতে ঢুকেছে। ডি'সিলভা নামটা তো আর আমাদের বাইরে কারুর জানার কথা নয়। কোথাও এ নাম দেখানো হয়নি। উত্তেজিত হয়ে ব্রায়ান বলে উঠল,—দাঁড়াও তুমি একা যেও না। তোমার সঙ্গে কয়েকজন মানুষ পুলিশও যেন যায়। আর এক্ষুনি। সমানে ট্র্যাকিং চালু রাখো। তোমাদের বাইরে আর কেউ যেন না জানে।

—ও.কে. স্যার—বলে ডি'সুজা ফোন কেটে দিল।

রোবট পুলিশদের নিয়ে এই এক মুশকিল। যেটা করে একদম ঠিকঠাক করে। চেষ্টার কোনও ফাঁক রাখে না। দিনরাত এক করে কাজ করে। কিন্তু অনেকসময় খুব সহজ কথা বুঝতে ভুল করে ফেলে। কিন্তু এতবড় ভুল করার লোক তো ডি'সিলভা নয়। ও কেন একথা বলল? তা হলে কি ও খবর দেখছে না? না কি ও ডি'সিলভা নয়?

॥ 21 অক্টোবর, বিকেল চারটে ॥

রবীন্দ্র মল। কলকাতার সবচেয়ে বড় শপিং মল। মলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মুভিং ফ্লোর। প্রায় পাঁচমাইল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কুড়িতলা মলটা প্রায় ২০০টা জোনে ভাগ করা আছে। প্রত্যেকটা জোনে কয়েকটা করে সুইচিং রুম আছে। ওই রুমগুলোর মধ্যে ঢুকে প্রয়োজনমতো যেখানে যাওয়ার দরকার সেই জোন সিলেক্ট করলেই হল। ওই রুম ঝড়ের বেগে ছুটে চলবে, প্রয়োজনমতো ওপর-নীচে ওঠানামা করবে, যতক্ষণে না ওই নির্ধারিত জোনে পৌঁছোয়। পৃথিবীতে কয়েকটা মাত্র মল আছে যেখানে এই সুবিধে আছে। তাই মলে কেনার লোকের থেকে সুইচিং রুমে ঢুকে ঘোরার লোক বেশি, ভিড়ও হয় সেরকম। এই মলটা তাই ভাইরাস ছড়ানোর আদর্শ জায়গা।

ঘুরতে-ঘুরতে চারদিকে এত লোক দেখে আনন্দে মনটা ভরে গেল ডি'সিলভার। সবরকম বয়সের নানান দেশের লোক। এরা জানবেও না যে এরা সাংঘাতিক এক অসুখে আক্রান্ত হতে চলেছে। যার একটাই পরিণতি—মৃত্যু। খোলা হাওয়াতে তাও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খানিকটা কম—কিন্তু মলের বদ্ধ বাতাসে বাঁচবার কোনও পথ নেই।

দুটো বাচ্চা একটা পাথরের ঘোড়ার ওপর চেপে বসতে চেষ্টা করছিল, ডি'সিলভা হাসি-হাসি মুখে ওদের দিকে এগিয়ে গেল। একজনকে কোলে তুলে ঘোড়ায় উঠিয়ে দিল। বাচ্চাটা, 'থ্যাঙ্ক ইউ'—বলে উঠে বসল। ডি'সিলভা চাপা হেসে অস্ফুটে বলে উঠল, 'বাই ফ্রম লাইফ'। দ্বিতীয়জনকে তুলতে গিয়ে হঠাৎ চোখ পড়ল দোকানের সামনের কাচের দিকে। বাচ্চাটাকে ছেড়ে আস্তে-আস্তে কাচের দিকে এগিয়ে গেল। নিজেকে কাচের আয়নায় দেখে আর্তনাদ করে উঠল,—ও মাই গড!

কয়েক মিনিট নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে আস্তে-আস্তে পিছু হঠে মলের বেরোনোর গেটের দিকে এগিয়ে গেল। বেশ খানিকটা পথ। অনেকক্ষণ হল ঘুরছে। সুইচিং রুম ব্যবহার করারও আর ইচ্ছে নেই। পা দুটো যেন আর শরীরটাকে টানতে পারছে না। কী করে হল? এরকম হওয়ার তো কথা ছিল না।

মলের মধ্যে এশিয়া টিভির নিউজ দেখানো হচ্ছে। কতদিন খবর দেখা হয়নি। একবার দেখা দরকার। অনেক সময় অনেক কিছুর ক্লু পাওয়া যায় খবরে। মলের বাতাসে লেসারের মাধ্যমে ভাসমান নিউজ ডেস্ক তৈরি করা হয়েছে। এক মহিলা ইংরেজিতে খবর পড়ছেন। আরে এ তো ওকে নিয়েই খবর হচ্ছে! কিন্তু নামটা

ওরকম কেন? ডিসিন্‌হা? চোখে ভুল দেখছে না কি? খানিক আগে যে রোবট পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা হল তাকে তো ও আসল নামটা বলে দিয়েছে। দ্রুত পায়ে ও বেরোনোর গেটের দিকে এগোতে থাকে। বড় একটা ভুল করে ফেলেছে।

ঠিক এই সময় ভূতের মতো কোত্থেকে প্রায় দেওয়াল ফুঁড়ে ওই রোবট পুলিশ অফিসারটা উদয় হল। হাতে একটা বন্দুক। উলটোদিকে ছুটতে শুরু করল ডি'সিলভা। মেনটেনান্স রুমের দিকে যেতে হবে। ওখান থেকে এসি ডাক্টের মধ্যে ঢুকে যাওয়া যাবে। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে ছোটা শক্ত। বারবার এর-ওর সঙ্গে ধাক্কা লাগতে লাগল। হঠাৎ করে পিঠে একটা গুলি এসে লাগল। ছিটকে মাটিতে গিয়ে পড়ল ও। উঠে দাঁড়িয়ে পালাতে যাবে, তার আগেই বেশ কয়েকটা বন্দুক ফের গর্জে উঠল। মলের সব আলো কে যেন হঠাৎ করে নিভিয়ে দিল।

॥ 21 অক্টোবর, বিকেল পাঁচটা, ঋকের বাড়ি ॥

—মিসেস বোস। গুড নিউজ আছে। থানা থেকে অফিসার ব্রায়ান বলছি। খানিকক্ষণ আগে ডি'সিলভা ধরা পড়েছে রবীন্দ্রমলে।

—বলেন কী! এ তো দারুণ খবর! জ্যান্ত? ফোনটাকে অডিও থেকে ভিডিও মোডে সুইচ করে মনিদীপা বলে উঠল।

—নাহ্, শুট আউটে মারা গেছে। এত সহজে ধরা দেয়? সারা পৃথিবীর পুলিশকে এত বছর ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। অন্য একজনের আইডি ব্যবহার করে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল। শেষে আমরা ওর চাল ধরে ফেলি। উফ্—এই ক'দিন দু-চোখের পাতা এক করতে দেয়নি। আর ক'দিন চললে আমিই হাই ব্লাডপ্রেশারে মারা যেতাম।

—তা, এবার ঋক বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে তো?

—অবশ্যই। আমি ওর অফিসেও জানিয়ে দিয়েছি। ও চাইলে কালকেই অফিসে জয়েন করতে পারে।

—আমি এক্ষুনি ওকে বলছি। বাড়িতে বসে ছুটি কাটানোর অভ্যেস নেই তো। বেরোনোর জন্য সমানে ছটফট করছে। থ্যাঙ্ক ইউ অফিসার। থ্যাঙ্ক ই-উ।

—শুনেছ-ও ফোন কেটে আনন্দে চিৎকার করে উঠল মনি।

॥ 21 অক্টোবর, সন্ধে ছ'টা ॥

—আনবিলিভেবল! আর ক'টা এরকম কেস পাওয়া গেছে? গম্ভীরভাবে বিজয়রত্নে বলে উঠলেন।

—আজ সকাল থেকে চারটে। জাস্ট শেষ দশদিনে এদের বয়স যেন দশবছর বেড়ে গেছে।

—ডাক্তার জয়বর্ধনে, আপনার কী মনে হয়? নতুন কোনও অসুখ?

—নতুন তো বটেই। এত তাড়াতড়ি বয়স বেড়ে যেতে তো কখনও দেখিনি। আর এরা কেউই প্রোজেরিয়ার রুগি নয় যে এমনিতেই অকাল বার্ধক্য হবে। সুস্থ সবল মানুষ। হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে একদিনের মধ্যে বছরখানেক বয়স যেন বেড়ে গেছে। রাতারাতি চুল পেকে যাচ্ছে। গালের চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে, পায়ের জোর কমে যাচ্ছে, দাঁত পড়ে যাচ্ছে। একলাফে ছোকরা থেকে বুড়ো। আর অসুখটা মারাত্মক ছোঁয়াচে।

—তা এদেরকে কোয়ারানটাইন করা হয়েছে তো?

—হ্যাঁ, সে তো বটেই। সঙ্গে-সঙ্গে একদম আলাদা হাই সিকিউরিটি জোনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে কেউ বেরোতে পারে না, সেখানে কেউ যেতেও পারে না। স্পেশাল রোবট খাবার দিয়ে আসছে। এক মাইল রেডিয়াসের মধ্যে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু অলরেডি হয়তো লেট হয়ে গেছে।

—লেট কেন? তার আগেই এরা অন্যদের সংক্রামিত করেছে বলছেন?

জয়বর্ধনে একটু দ্বিধা নিয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়ে বলে উঠলেন,—প্রথম কয়েকদিন এর প্রভাব অতটা বোঝা যায় না। এ তো আর জ্বর নয় বা হঠাৎ করে খুব অসুস্থ হয়ে পড়া নয়। আপনি আপনার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন—শুধু হয়তো ক্লান্তি অনুভব করছেন। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে—ব্যস এইটুকুই। আপনার কাছাকাছি যারা আছে তারা এসময় কিন্তু ইনফেকটেড হচ্ছে। যখন আপনি দেখলেন যে আপনার বয়স একলাফে দশ বছর বেড়ে গেছে, বুঝলেন যে আপনি এ অসুখের শিকার, ততক্ষণে আপনি হয়তো কয়েক হাজারকে একই রোগের শিকার করে বসে আছেন।

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট বিজয়রত্নে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন,—আপনারা কিছু লুকোচ্ছেন। আমার মনে হয় অলরেডি আপনারা আরও অনেক বেশি সংক্রমণের খবর জানেন। ঠিক কতজন এ পর্যন্ত সংক্রামিত হয়েছে?

—প্রমাণিত কেস একশো সাতচল্লিশটা।

—আর ইনফেকটেড হওয়ার সম্ভাবনা আছে এরকম কতজনকে পেয়েছেন?

কোনও উত্তর না পেয়ে বিজয়রত্নে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন,—আই নিড দ্য নাম্বার। নাউ!

—তিপ্পান্ন হাজার সাতশো দশ। দশমিনিট আগে অবধি। সংখ্যাটা এর মধ্যে হয়তো আরো কয়েক হাজার বেড়ে গেছে। সংখ্যাটা এক্সপোনেনশিয়ালি বাড়ছে।

বিজয়রত্নে কোনওরকমে চেয়ারের হাতল ধরে বসে পড়লেন।—কী করে?

—এই ভাইরাস খুব তাড়াতাড়ি বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে যাচ্ছে। রোগীর পাঁচফুটের মধ্যে এলেই হল। খুব সুস্থ-সবল লোকও ইনফেকটেড হয়ে যাবে। এ-ঘরের একজনের মধ্যেও যদি এই ভাইরাস থেকে থাকে এতক্ষণে আমাদের সবার মধ্যে তা ছড়িয়ে গেছে।

বিজয়রত্নেকে সবাই ডাকাবুকো প্রেসিডেন্ট বলে জানে। তার মুখেও কোনও কথা নেই। ভয়ে আতঙ্কে মুখটা কালো হয়ে গেছে।

ডাক্তার জয়বর্ধনে ফের বলে উঠলেন,—তবে এ-ঘরের কারোর মধ্যে এখন এ ভাইরাস নেই। ঢোকার আগেই আমরা সবাই টেস্ট করিয়ে তবে ঢুকেছি। এজন্যই আপনার হোম মিনিস্টার আজ মিটিং-এ নেই। উনিও ইনফেকটেড।

—কী-কী করে এ অসুখ-এ ভাইরাস এল? টেররিস্ট অ্যাটাক? বসা গলায় বিজয়রত্নে বলে উঠলেন।

—নিঃসন্দেহে বলা যায় টেররিস্ট অ্যাটাক। এরকম ভাইরাস স্ট্রেন আগে কখনো দেখা যায়নি। তা ছাড়া আমাদের ধারণা, ন্যানো টেকনোলোজির সাহায্যে এ ভাইরাস সারা শরীরে খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছে। ভাইরাস খুব কম সময়ের মধ্যেই নিজের হাজার-হাজার কপি তৈরি করছে। স্বাভাবিকভাবে এটা হয় না। এ ভাইরাস ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে ছাড়া হয়েছে। এমন ভাইরাস যা খুব তাড়াতাড়ি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত শয্যাশায়ী হওয়ার আগে আরও অনেককে সংক্রামিত করার সুযোগ পায়।

—এ তো পুরো শ্রীলঙ্কাকে ধ্বংস করতে পারে।

—শুধু শ্রীলঙ্কা নয়, পুরো পৃথিবী—পুরো সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এ ভাইরাসের শিকার হয়ে। অলরেডি শ্রীলঙ্কা থেকে টেররিস্টরা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ডি'সিলভা,—যে ওদের মাথা তাকে দেড়ঘণ্টা আগে ভারতে ধরা হয়েছে। শুট আউটে মারা গেছে। কিন্তু তার আগে কতজনকে ইনফেক্ট করেছে, কে জানে? বিদেশ সচিব মধুকরণ বলে ওঠেন।

—ও যে এরকম একটা ভাইরাস বহন করছিল তা আপনারা ভারত সরকারকে জানিয়েছেন?

—না এখনও আমরা জানাইনি। ব্যাপারটা পলিটিক্যাল হয়ে যেতে পারে। ডি'সিলভা সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী শ্রীলঙ্কার নাগরিক।

—তা যাই হোক না কেন, আপনি ইমিডিয়েটলি জানান। তারপরে আমি নিজে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করছি।

॥ 21 অক্টোবর, রাত আটটা ॥

এশিয়া ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সে উপস্থিত আছে ভারত, চিন, জাপান, ইরান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ম্যালেশিয়া, হংকং, শ্রীলঙ্কা ও অন্যান্য দেশের পদস্থ আধিকারিকরা। স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা। উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট ডাক্তার ডঃ বাগচী ও ডঃ কেভিন।

ব্লাড রিপোর্টটা ব্রায়ানের দিকে এগিয়ে দিয়ে ডঃ বাগচী বলে উঠলেন,—শ্রীলঙ্কা সরকার যে ভাইরাসের কথা বলেছে, ডি'সিলভার রক্তে সেই ভাইরাস পাওয়া গেছে। এখন ও কত জনকে ইনফেক্ট করেছে বলা মুশকিল। তবে এটা নিশ্চিত যে, মলে যতজন ছিল তারা প্রত্যেকেই সংক্রামিত হয়ে গেছে।

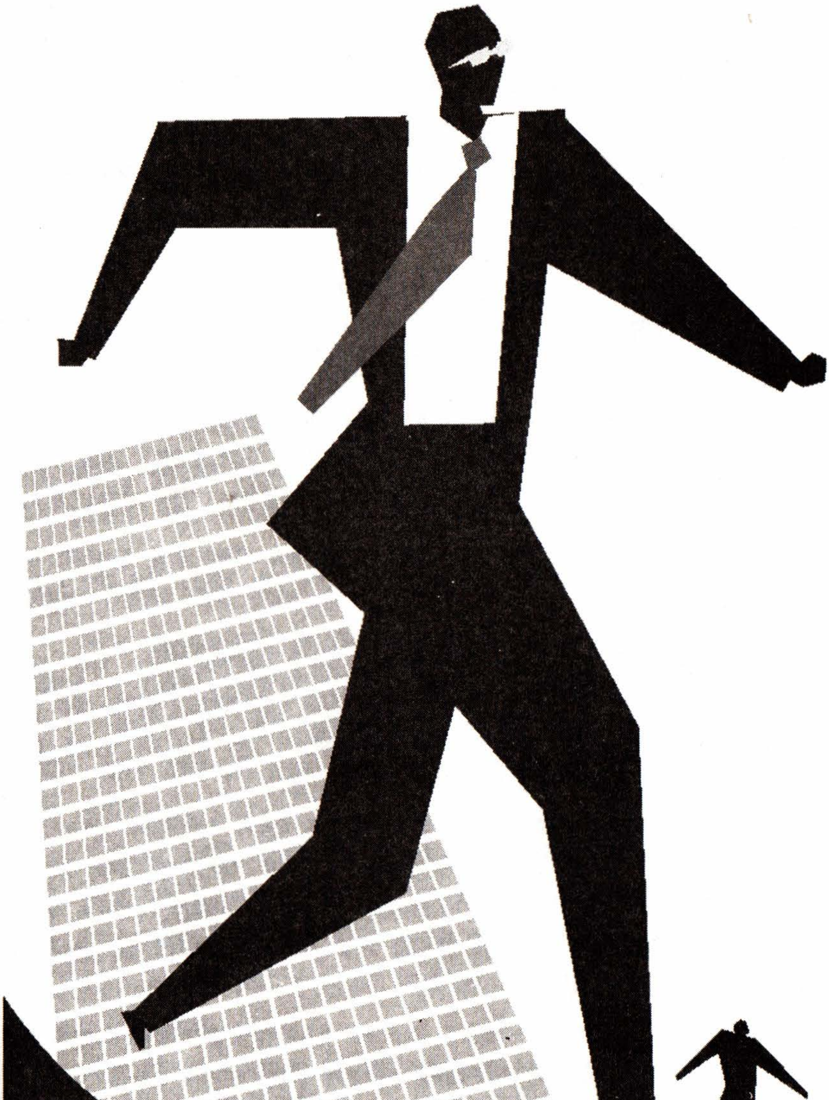
ব্রায়ান বলে উঠলেন,—ওই মলে যতজন ছিল, এমনকী আমাদের যতজন পুলিশ অফিসার ছিল তাদের সবাইকে আমরা বিশেষ একটা জায়গায় নিয়ে রেখেছি। বাইরের জগৎ থেকে তাদের পুরো আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। তাদের ব্যবহার করা সব জিনিস আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে।

—কিন্তু এখন তো তারা শুধু ইনফেকটেড নয়। মাঝের বেশ কয়েক ঘণ্টা এরা বাস-ট্রেন চড়ে থাকতে পারে, সিনেমা হলে যেতে পারে, কোথাও খেতে যেতে পারে। সেখানে এরা আরও লোককে ইনফেক্ট করেছে। এদের বাড়ির সকলেও নিশ্চয়ই ইনফেকটেড। আমাদের তো তা হলে পুরো শহরের সব লোককে আলাদা জায়গায় সরিয়ে রাখতে হয়। আর ডি'সিলভা গত ক'দিনে আরও কত জনকে সংক্রামিত করেছে কে জানে?

—তো উপায়?

—উপায় একটাই। এ শহরের প্রত্যেকের ব্লাড টেস্ট করা হোক। এমনকী আমাদেরও। যার রক্তে ওই ভাইরাস ধরা পড়বে, তাকেই কোয়ারানটাইন করতে হবে।

ডঃ কেভিন অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা বলার চেষ্টা করছিলেন। সুযোগ পেয়ে বলে উঠলেন,—আমার আরেকটা কথা বলার ছিল, হয়তো প্রাসঙ্গিক নয়। তবুও—গত কয়েকদিনের মধ্যে ডি'সিলভার কোনও ব্রেন মাইক্রোসার্জারি হয়েছিল। খুব পাকা হাতের কাজ। আমরা অনেক সময় মেমারি বাড়ানোর জন্য চিপ ব্যবহার করে থাকি, তা ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট করা হয়। সেরকমই কোনও অপারেশন হবে।



ডঃ কেভিনের কথায় খানিকটা রিবক্ত হয়ে ব্রায়ান বলে উঠলেন,—আমরা এখানে অনেক বড় সমস্যার সামনে, ওসব ছোটখাটো কথা বলে প্লিজ সময় নষ্ট করবেন না। আমাদের হাতে সময় সত্যিই কম।

ব্রায়ানের বস মিঃ পান্ডিয়ান বলে উঠলেন,—আমাদের খুব ছোটখাটো কথাও ভেবে দেখতে হবে। আমার কিন্তু এখনও বেশ কয়েকটা জায়গায় খটকা লাগছে। প্রথমত অনন্ত অর্থাৎ ডি'সিলভা নিজে কেন ইনফেকটেড হল? ওর তো ভ্যাকসিন নিয়ে রাখার কথা তাই না? যাতে নিজের না হয়। তা ছাড়া মলের সিকিউরিটি ক্যামেরার রেকর্ডিং থেকে দেখেছি ও কাচের আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠেছিল। কেন? এটা কি ওর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল?

এবার দ্বিতীয় বিষয়ে আসি। আচ্ছা, ডি'সিলভার ভারতে আসার কী দরকার ছিল? শুধু আরও কিছু লোককে সংক্রামিত করতে? তা সে তো এমনিতেই হত। শ্রীলঙ্কা থেকে গত ক'দিনে বহু সংক্রামিত লোক ইতিমধ্যেই পৃথিবীর নানান প্রান্তে গেছে। তারাই যথেষ্ট। তিন নম্বর, ও ঋকের আইডি নিল কেন? আর ঋকের সঙ্গে আলাদা করে দেখা করল কেন? ওকে শুধু সংক্রামিত করার জন্য? এ তো হাতি মারতে কামান দাগা।

পাশ থেকে ব্রায়ান আস্তে বলে উঠলেন,—হাতি নয়, কথাটা হল মশা মারতে কামান দাগা।

—ওই একই হল। চারনম্বর এবং, মোস্ট ইম্পর্ট্যান্টলি, ঋক কেন ইনফেকটেড হল না? সবাই এত সহজে ইনফেকটেড হয়ে যাচ্ছে। অথচ ঋক প্রায় আধঘণ্টা ডি'সিলভার সঙ্গে থাকার পরও ইনফেকটেড হল না। কী কারণ হতে পারে? আমরা বড় কোনওরকম ভুল করছি না তো?

খানিক থেমে এশিয়ার ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান পান্ডিয়ান ফের বলে উঠলেন,—ঋকের তা হলে নিশ্চয়ই প্রতিষেধক নেওয়া ছিল। তা হলে কি ও ডি'সিলভার দলেরই লোক? ঋকের প্রোফাইল আমাদের খুঁটিয়ে দেখতে হবে। দেখতে হবে ওর বউ-এর প্রোফাইলও। কী নাম যেন—মনিদীপা—কী করে সে জানেন?

ব্রায়ান বলে উঠলেন,—বিয়ের আগের সারনেম রঙ্গরাজন। ছোটবেলা কেটেছে শ্রীলঙ্কায়। ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং। ভাইরাস নিয়ে নানান রিসার্চ আছে।

ডঃ কেভিন পাশ থেকে বলে ওঠেন,—প্রোজেরিয়া রোগটা জানেন তো? জিনের মিউটেশন থেকে হয়। জন্মগত রোগ। খুব কম বয়সে বেশি বয়সের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। চুল পড়ে যায়। দাঁত পড়ে যায়। হাড়ের গঠন ঠিকমতো হয় না। চেহারা বড় হয় না। বারো-তেরো বছর বয়সের মধ্যেই বাচ্চাগুলো মারা যায়। মিসেস মনিদীপা বোস প্রোজেরিয়ার ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন। এ

ব্যাপারে উনি সারা পৃথিবীর অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন।

—আচ্ছা এরপরও আপনারা হাত গুটিয়ে বসে আছেন? ইমিডিয়েটলি ঋক ও মনিদীপাকে অ্যারেস্ট করুন! প্রোজেরিয়ার লক্ষণযুক্ত ভাইরাস তো তার পক্ষেই তৈরি করা সম্ভব যে তার ওষুধ বার করার চেষ্টা করছে—তাই না? তা ছাড়া শ্রীলঙ্কায় জন্ম। কোনও কানেকশন নেই তো? আমি কনভিনসড। দে আর পার্ট অফ ডি'সিলভাস টিম। ওরাই এ ভাইরাস তৈরি করছে। মিঃ পান্ডিয়ান উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

॥ 21 অক্টোবর, রাত ন'টা, ঋকের বাড়ি ॥

ম্যাসেজ চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে ছিল ঋক। চেয়ারটা তার আকার পরিবর্তন করে-করে কখনও গলাবন্ধ পোশাক হয়ে বুকে-পিঠে বা কখনও হেলমেটের মতো মাথায় এঁটে বসছিল। এতো নিখুঁত আরামের ম্যাসেজ কোনও মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আরামে বুজে আসা আধখোলা চোখে ঋক বাতাসে ফুটে ওঠা খবর দেখছিল। এসময় মনিদীপা ঘরে ঢুকল।

ঋক, তোমার জন্য যে নতুন টেম্পারেচর কন্ট্রোলড জামাটা এনেছি পরে দেখালে না তো?—মনিদীপা বলে ওঠে।

—আবার ওই জামা এনেছ, এমনিতেই তো এসিতে সারাক্ষণ থাকি। কী দরকার বলো তো ওই জামা পরার! তা ছাড়া এমনি জামার তুলনায় এগুলো বেশি ভারী হয়।

—আহা একটু পরেই দ্যাখো না! কতটুকু টাইম লাগবে!

বাধ্য হয়ে ম্যাসেজ বন্ধ করে উঠে বসে ঋক। গায়ের জামা খুলে মনিদীপার হাতে ধরা জামাটা পরতে যায় ঋক। অবাক হয়ে ঋকের দিকে তাকিয়ে মনিদীপা বলে ওঠে,—আচ্ছা, তোমার বুকের ডানদিকে যে কালো আঁচিলটা ছিল, সেটা কোথায় গেল বলো তো?

ঋক আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়—ঠিকই বলেছ, অবাক কাণ্ড! আমি নিজেই এতদিন খেয়াল করিনি!

ফের ও মনির দিকে ঘুরে তাকায়। মনিকে আজ একদম অন্যরকম লাগছে। বয়স যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেছে। মনি ঋকের তাকানো দেখে বুঝতে পেরে নিজেই সেটা বলে ওঠে,—খুব অদ্ভুত কিছু একটা হচ্ছে জানো তো? কাল থেকে আমার গোছা-গোছা চুল উঠে যাচ্ছে। তিন-চারটে দাঁতও নড়ছে। আজকে সকাল

থেকে সারা গায়ে, গাঁটে-গাঁটে প্রচণ্ড ব্যথা। যেন শরীরের ভার আর বইতে পারছি না। একটু থেমে মনি বলে ওঠে,—ভয় লাগে। আমি যে পেশেন্টদের নিয়ে কাজ করি—তাদেরও এরকম লক্ষণ। এ হল প্রোজেরিয়ার লক্ষণ। কিন্তু একদিনে আমার কী হল সেটাই আশ্চর্য। আর প্রোজেরিয়া তো ছোঁয়াচে রোগ নয়। এ তো জেনেটিক রোগ।

—বাবা-বাবা—দ্যাখো কী হয়েছে! ঋভুর ডাকে ঘাড় ফেরায় ওরা।

—এ কী—তোর মাথার চুল কী হল? ঋক অবাক হয়ে বলে ওঠে।

—পড়ে গেল। চুল আঁচড়াতে গিয়ে। ঠিক ম্যাজিশিয়ান ওয়াং-এর মতো। দ্যাখো আঙুলগুলোও কীরকম হয়ে গেছে। ঋভু ওর আঙুলগুলো দেখায়। এ কার আঙুল! দেখে মনে হয় মধ্যবয়সি কোনও লোকের।

ঋক ছেলেকে জড়িয়ে ধরে পাশে বসে পড়ে। ঋভুর একমাথা চুল রাতারাতি উধাও। কী সুন্দর একমাথা কোঁকড়ানো চুল ছিল।

মনি চট করে ঋভুকে কাছে টেনে নেয়। স্থির দৃষ্টিতে ঋকের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। বলে ওঠে,—কে—কে তুমি?

অবাক হয় ঋক।—কেন?

মনি ঋভুর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে খানিকটা দূরে নিয়ে যায়। খসখসে গলায় ফের বলে ওঠে,—তুমি ঋক নও, কে তুমি? ডি'সিলভা?

ঋক মনির দিকে দু-পা এগিয়ে যায়।—তুমি কি পাগল হয়ে গেছ মনি? আমি—আমি ঋক।

—খবরদার, আর এক পাও এগোবে না। তোমার সব চালাকি বুঝে গেছি ডি'সিলভা। বুঝে গেছি কেন তুমি আমাকে টার্গেট করেছ! তোমার কাছে খবর ছিল আমি প্রোজেরিয়ার ওষুধ প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছি। আর তাই তুমি সবার আগে আমাদের ইনফেক্ট করেছ। যাতে তোমার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। আমি খানিক আগেই খবর দেখেছি। এ ভাইরাসে শ্রীলঙ্কায় হাজার-হাজার লোক আক্রান্ত। সেখানে আমার ওষুধ বাজারে এলে তোমাদের প্ল্যান সব ভেস্তে যাবে। ঋককে কী করেছ? মেরে ফেলেছ?

—বিলিভ মি, মনি। কী বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমাকে, ঋভুকে আমি কেন এরকম করব! ঋক ওদের দিকে আরও এগিয়ে যায়। কান্নায় ওর গলা অবরুদ্ধ হয়ে আসে।

আর তখনই দরজায় জোরে ধাক্কার আওয়াজ হয়। কিছু বোঝার আগেই দরজার লক ভেঙে ঘরে ঢুকে আসে কয়েকজন পুলিশ, মুখে তাদের মাস্ক পরা।

॥ 14 জানুয়ারি, রোববার, সকাল দশটা ॥

অডিটোরিয়াম ভরতি মিডিয়ার লোকজনের সামনে স্পেশাল ডিরেক্টর ক্রাইম ব্রাঞ্চ ব্রায়ান বলতে শুরু করেন। প্রোগ্রামটা সারা পৃথিবীর বড়-বড় চ্যানেলগুলোতে লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে।

—প্রথমেই বলি এটা অত্যন্ত জটিল কেস। যতটা সম্ভব সরলভাবে বলার চেষ্টা করছি। পুরো দু-হাজার বারো পাতার রিপোর্ট প্রেস কনফারেন্সের পরেই ওয়েবসাইটে পাবলিশ করে দেওয়া হবে। আমরা—এর পিছনে যে টেররিস্ট অর্গানাইজেশনের হাত ছিল, সেই 'এজমুল্লা'-র প্রায় সবাইকেই ধরতে পেরেছি। পুরোটা যার প্ল্যান—সেই ভ্যাসিল ডি'সিলভা পুলিশ কাস্টডি-তে সুইসাইড করেছে। বাকিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করেছি।

—আচ্ছা, ডি'সিলভা সুইসাইড করল কীভাবে? ওকে তো রবীন্দ্রমলে গুলি করে মারা হয়েছে। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করে ওঠে।

—আমাকে একটু প্রথম থেকে বলতে দিন। আপনারা বুঝতে পারবেন। ডি'সিলভা পৃথিবী জুড়ে অনেকগুলো সন্ত্রাসবাদী ঘটনার সঙ্গে আগেও যুক্ত ছিল। কিন্তু ওর এবারে প্ল্যানটা ছিল সব থেকে জটিল—সবথেকে ভয়ংকর। এমন একটা চাল, যাতে পুরো মানবসভ্যতাকে চেকমেট করে দেওয়া যাবে। ওদের সংগঠন মারাত্মক এক ভাইরাস তৈরি করে—যার লক্ষণ প্রোজেরিয়া রোগের মতো। যার হবে—তার মৃত্যু হবে সংক্রামিত হওয়ার দু-তিনমাসের মধ্যে। অকাল বার্ধক্যের কারণে। নতুন ভাইরাস। এত তাড়াতাড়ি কোনও ওষুধ বার করা সম্ভব নয়।

কিন্তু সমস্যা হল অন্য জায়গায়। ভাইরাস ছড়াতে শুরু করার কয়েকদিন আগে ওরা জানতে পারল অস্ট্রিয়ার এক বিজ্ঞানী প্রোজেরিয়া-র ওষুধ বার করছে। নাম তার মনিদীপা বোস। ক্লিনিকাল ট্রায়ালের শেষ পর্যায়ে ওষুধটা। একই ওষুধ ওদের ভাইরাসের ওপরেও নিশ্চয়ই কাজ করবে। তখনই ওরা ঠিক করে নেয় মনিদীপাকে যে-কোনও ভাবে কাজে বাধা দিতে হবে—তা হলে তার মধ্যেই ওদের কাজ হাসিল হয়ে যাবে। এ রোগ মহামারীর আকার ধারণ করবে। তাই ডি'সিলভাদের প্রধান টার্গেট ছিল ঋক নয়—ঋকের স্ত্রী মনিদীপা।

—তা হলে ডি'সিলভা ঋককে টার্গেট করল কেন? আরেকজন সাংবাদিক চেঁচিয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, সেটাই বলছি। টেররিস্টরা সবসময় দুর্বলতম জায়গায় আঘাত করে। মনিদীপা অবধি পৌঁছোনো প্রায় অসম্ভব কাজ ছিল। ও সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তা পায়। তাই ওরা ঋককে বেছে নেয়। ডি'সিলভাকে এমনিতেই দেখতে একদম ঋকের মতো। ঋক কমপ্লিট ডেটা সলিউশনের (CDS) উচ্চপদস্থ অফিসার। ও ঋককে

টার্গেট করে কয়েকটা কারণে। প্রথমত, ঋকের মাধ্যমে মনিদীপাকে ইনফেক্ট করা যাবে। দ্বিতীয়ত, ইনফেক্ট করা যাবে CDS-এর অফিসারদের—সাধারণভাবে যাদের কাছাকাছি আসা কষ্টকর কাজ। আর CDS-এর লোকদের আক্রান্ত করা মানে পুরো এশিয়ার ব্যাঙ্কিং সিস্টেমকে ধসিয়ে দেওয়া—যেরকম কয়েকদিন আগে হয়েছে। এক ঢিলে দুই পাখি।

কিন্তু ঋককে শিকার করার পিছনে সবথেকে বড় কারণটা আমরাও প্রথমে বুঝিনি। ছোটবেলা থেকেই ঋকের মেমারি-র প্রবলেম ছিল। খুব তাড়াতড়ি সব কথা ভুলে যেত। তাই ও একটা কৃত্রিম মেমারি চিপ ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট করেছিল। রেয়ার হলেও এখন কেউ-কেউ ওটা করে থাকে। কোনও কথা মনে রাখতে ব্রেনের যে অংশ কাজ করে সেই হিপ্পোক্যাম্পাস-এর কাজ সারে এই মেমারি চিপ। এই চিপ আমাদের যাবতীয় পুরোনো স্মৃতি ধরে রাখে।

এটাই ছিল ঋককে সিলেক্ট করার পিছনে সবথেকে বড় কারণ। কারণ এই চিপ বদলে দেওয়া মানে ঋক নিজেও বুঝতে পারবে না যে ও ঋক। আর তার জায়গায় স্পেশালি প্রোগ্রাম করা চিপে যার চিন্তাভাবনা থাকবে, যার মেমারি থাকবে—ও নিজে তারই সত্ত্বা পাবে। তাই জাস্ট মেমারি চিপ বদলে দেওয়া হল। ঋক হয়ে গেল ডি'সিলভা—আর ডি'সিলভা নিজেকে ভাবল ঋক।

—তা আইডি চুরি করল কেন?

—আহা, মন দিয়ে শুনছেন না। আইডি তো চুরিই হয়নি। ঋকের আইডি ঋকের কাছেই ছিল। ও শুধু নিজেকে ডি'সিলভা মনে করছিল এই যা। নিজেকে ভাবছিল পৃথিবীর সবথেকে বড় টেররিস্ট হিসেবে, আর সেটাই হল ওর মৃত্যুর কারণ। রবীন্দ্র মলে শুট আউটে মারা গেছে আসলে ঋক।

অডিটোরিয়ামে জোর গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। এক সঙ্গে নানান প্রশ্ন ভেসে এল।—তা ডি'সিলভা কোথায় গেল? পুলিশ এত বড় ভুল করল কী করে?

—ঋক বলে যাকে ভাবা হচ্ছিল, সে কি ডি'সিলভা?—কখন মেমারি চিপ বদলানো হল?—ডি'সিলভার চিপ লাগানোর কী দরকার ছিল?

বারবার অনুরোধ করার পরে চিৎকার থামলে ব্রায়ান আবার শুরু করলেন,—আমি আপনাদের সব প্রশ্ন নেব। বাট লেট মি ফার্স্ট কমপ্লিট। অন্যদিকে ডি'সিলভা ঋকের মেমারি চিপ তার ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট করে ঋকের পুরো স্মৃতির অধিকারী হয়ে উঠল। ঋকের শুধু স্মৃতিই যে ও পেল তা বললে ভুল হবে। ও নিজেকে সত্যিই ঋক বলে ভাবতে শুরু করল। তাই ঋকের ছেলে-বউকে ইনফেকটেড হতে দেখে ও নিজে মানসিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়ে। পরে সুইসাইড করে। এটাই ছিল ওর প্ল্যানের একমাত্র ভুল দিক।

ডেলি ইংলিশের সাংবাদিক জন উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে,—তা পুরো

কাজটা তো অনেক সহজেই করতে পারত। জাস্ট ঋকের সঙ্গে দেখা করে ওকে সংক্রামিত করলেই তো কাজ হাসিল হয়ে যেত। তার জন্য এত কাণ্ড করার কী দরকার ছিল?

—না, হত না। কারণ সেক্ষেত্রে ঋকের মধ্যে সঙ্গে-সঙ্গে অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেত। ঋক নিজেও জেনে যেত যে ও সংক্রামিত। ও আর কাউকে—বিশেষত মনিদীপাকে ইনফেকটেড হতে দিত না। অন্যদিকে ডি'সিলভা আগেই এ-ভাইরাসের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন নিয়েছিল বলে ওর কিছুই হয়নি। পরে ও নিজেই বুঝতে পারেনি যে ও এক সাংঘাতিক ভাইরাসের বাহক। রোগের ক্যারিয়ার হয়ে ও নিজের অজান্তেই সবাইকে ইনফেকট করে গেছে। বাদ পড়েনি যাদেরকে ও বউ-ছেলে ভাবছে তারাও। ও কিন্তু তখন ইচ্ছে করে কিছু করছিল না।

এ তো গেল একটা কারণ। এ ছাড়া ডি'সিলভা ঋকের মেমারি চিপ ব্যবহার করায় থানাতেও ওকে ধরা যায়নি। ব্রেন ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এ মনের গভীরে কে কী ভাবছে তাও বোঝা যায়। তাই ঠিক বোঝা যেত ডি'সিলভা কী ভাবছে—বানিয়ে কিছু বলছে কি না। এখানে ও নিজেই তো জানত না যে ও টেররিস্ট। তাই ধরাও পড়েনি। রিয়াল মাস্টারস্ট্রোক। টেররিস্ট বডি আর ইনোসেন্ট মাইন্ড—ডেডলি কমবিনেশন।

—আমরা কনফিউসড। ঠিক কী-কী হয়েছিল পরপর একটু বলবেন? দ্য মমার্তে-র ফ্রেঞ্চ সাংবাদিক বলে উঠলেন।

—ও.কে., আমি পরপর ঠিক কী-কী হয়েছিল বলছি। ডি'সিলভা শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে ঢোকে সুন্দরবন হয়ে। লক্ষ্য ঋকের সঙ্গে দেখা করা। সঙ্গে ছিল আরেকজন টেররিস্ট। কুখ্যাত সার্জেন আজমল খান। ওরা ঋককে ট্রেনে ফলো করে। তারপর ঋক ট্রেন থেকে নামার পরে ওকে কিডন্যাপ করে ঝিলিমিলি পার্কে নিয়ে আসে।

ডি'সিলভা স্প্রে করে ঋককে অজ্ঞান করে। তারপর ডঃ আজমল খান ডি'সিলভাকে অজ্ঞান করে দুজনের ওপরেই নিপুনহাতে মাইক্রোসার্জারি করে। ঋকের মেমারি চিপ লাগানো হয় ডি'সিলভার ব্রেনে। আর স্পেশালি প্রোগ্রাম করা অন্য একটা মেমারি চিপ বসানো হয় ঋকের ব্রেনে যাতে ঋক নিজেকে ডি'সিলভা ভাবতে শুরু করে। তবে ইচ্ছে করে কিছু তথ্য বাদ দেওয়া হয়েছিল, যাতে ঋক পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ জন্যেই ও প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে। ঋকের কাছে ঋকের মানিব্যাগ, আইডি ছিল, ওটা কখনোই চুরি হয়নি।

একটু থেমে একটু জল খেয়ে ব্রায়ান ফের শুরু করলেন,—আজমল ঝিলিমিলি পার্ক ছেড়ে যাওয়ার আগে অনন্তের আইডি কার্ডটা ডি'সিলভার মানিব্যাগ

থেকে ঋকের মানিব্যাগে চালান করে দেয়। দুজনের কাছে অন্য যে ব্যাগ ছিল তাও বদলে দেয়। ডি'সিলভার মেকআপ কিট, সঙ্গে লেখা জামা ঋকের কাছে চলে আসে। ঋকের ফোন রেখে দেওয়া হয় ডি'সিলভার কাছে। ব্যস। ইনফ্যাক্ট, ঋকের জ্ঞান আগে ফেরে। ও অবাক হয়ে দ্যাখে ওর সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ঋক অর্থাৎ আসলে ডি'সিলভা। ও তাই তাড়াতাড়ি জায়গা ছেড়ে চলে আসে। নিজেকে ডি'সিলভা ভেবে পুলিশের নজর এড়িয়ে নানান জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে থাকে। এখানে ও প্রথমে ঋক ও পরে অনন্তের আইডেনটিটি-এর সাহায্য নেয়।

ডি'সিলভা আগেও অনন্তের আইডেনটিটির সাহায্য নিয়ে এরকম অনেক কাজ করেছে। এবার সেটাই ঋক করল।—ডি'সিলভার মেমারির অধিকারী হয়ে। আমাদের পুরো নজর গিয়ে পড়ে ওর ওপর। ওরা এটাই চেয়েছিল, যাতে আসল ডি'সিলভা মুক্ত হতে পারে। ওরা জানত যে অনন্ত কে আমরা ট্র্যাক করব।

আমাদের কাছে অনন্ত সম্বন্ধে ইনফরমেশন ছিল। আমরা অনন্তকে ট্র্যাক করে যখন ধরতে যাই, অনন্ত পালানোর চেষ্টা করে। আমাদের গুলিতে অনন্ত অর্থাৎ আসলে ঋক মারা যায়। ঠিক যেমনটা ওরা চেয়েছিল।

অন্যদিকে ডি'সিলভা নিজেকে ঋক ভাবছিল বলেই আমরা কেউ ওকে প্রথমে ধরতে পারিনি। ও যে ইনফেকটেড হয়নি—এ থেকেই আমরা ওকে শেষে চিনতে পারি। কারণ আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল যে টেররিস্টরা ভাইরাস ছড়ানোর আগে প্রত্যেকে ভ্যাকসিন নিয়ে নিয়েছিল যাতে নিজেদের কোনও ক্ষতি না হয়।

এতটা বলার পরে ব্রায়ান একটু থেমে বলে উঠলেন,—আশা করি, পুরো ঘটনাটা আপনাদের কাছে এখন ক্লিয়ার। সবশেষে আমাদের সবার তরফ থেকে মনিদীপা দেবীকে ধন্যবাদ জানাই। ওনার ওষুধ আবিষ্কারের জন্যই আমরা সবাই আজ রোগমুক্ত হয়েছি। ইনক্লুডিং মি। পুরো মানবসভ্যতা ওনার কাছে ঋণী। এ ভয়ানক সংক্রামক রোগের হাত থেকে আমাদের উদ্ধারের জন্য।

পিছনের দিক থেকে একজন সাংবাদিক চেঁচিয়ে বলে ওঠে,—মিঃ ব্রায়ান আমরা খবর পেয়েছি ডি'সিলভা এখনও বেঁচে আছে। সুইসাইডের খবরটা মিথ্যে।

চারদিকে সঙ্গে-সঙ্গে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। যেন স্কুলছুটির ঘণ্টা পড়ল। বেশ খানিকক্ষণ চুপ থেকে আওয়াজ কমলে ব্রায়ান ফের বলে উঠলেন,—ডি'সিলভার প্রাণভিক্ষা কে করেছেন জানেন? সেই মহিলা যার কাছে আমরা সবাই ঋণী। ইয়েস—মনিদীপা দেবীই চান যে ডি'সিলভাকে ক্ষমা করা হোক। তার কারণ ওর আর ঋকের মধ্যে ঠিক যে জায়গায় তফাত ছিল—সেটাই তো কেটে গেছে। ও আর টেররিস্ট নয়। আর তা ছাড়া ওকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই এ অসুখের ওষুধ এত তাড়াতাড়ি বার করা সম্ভব হয়েছে। ডি'সিলভার শরীরে যে প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছিল—তা অ্যানালাইজ করেই এ ওষুধ বার করা হয়েছে।

—কিন্তু ডি'সিলভার মতো সাংঘাতিক টেররিস্টকে ছেড়ে দেওয়ার কোনও অধিকার পুলিশের নেই। কী গ্যারান্টি যে ও আবার এরকম কাণ্ড ঘটাবে না? কোনও একজন সাংবাদিক বলে ওঠে।

—আজ আমরা যখন এই প্রেস কনফারেন্স করছি, তখন আপনাদের ওই কুখ্যাত টেররিস্ট কি করছে জানেন?

মিঃ ব্রায়ান—অডিটোরিয়ামের মধ্যে ভিডিও প্রোজেকশান চালু করেন। লাইভ ছবি। মনিদীপা-ঋকের বাড়ি থেকে। ওদের কাউকে না জানিয়ে।

ড্রইংরুমের মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে ঋভু, ডি'সিলভা আর মনিদীপা। সামনে একটা অদ্ভুত চারটে রঙের ঘর কাটা বোর্ড। আর একটা ফুটকি দেওয়া ছোট সাদা কিউব। একেই নাকি আগে লুডো বলা হত।

ডি'সিলভা তারস্বরে চেঁচিয়ে যাচ্ছে,—মনি, এ ভারী অন্যায়। তুমি ঋভুর কাঁচা ঘুটি খেলে না। আর আমার একদম পাকা ঘুটি খেয়ে ফেললে! ইস্, আর দু-ঘর গেলেই—না, না, অন্য কোনও চাল দাও। না হলে আমি আর খেলব না।

পাশ থেকে ঋভু চেঁচাচ্ছে, ওর গলা আরও এককাঠি ওপরে,—খেয়ে নাও মা, খেয়ে নাও। আগে বাবা তোমার একটা ঘুটি খেয়েছিল না!

॥ লেখকের কথা ॥

এ উপন্যাসের ঘটনা ২০৫১-তে সত্যি না হোক এটাই মনেপ্রাণে কামনা করি। কিন্তু এ উপন্যাস যে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা সবই হয়তো থাকবে ওই সময়। উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে ঋক আর ডি' সিলভা-র মধ্যে মেমারি এক্সচেঞ্জ। সত্যিই কি তা সম্ভব?

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া আর ওয়েক ফরেস্ট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম হিপ্পোক্যাম্পাস বা মেমারি বানানোর চেষ্টা করছেন যা কমস্মৃতিযুক্ত, অ্যালজাইমার ও স্ট্রোকে আক্রান্ত লোকেদের কথা মনে রাখতে সাহায্য করবে। এই হিপ্পোক্যাম্পাসই আমদের লংটার্ম মেমারির তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজটা দেখে।

স্বাভাবিক মেমারি-র জায়গায় ইলেকট্রনিক চিপ দিয়ে তৈরি কৃত্রিম মেমারি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই ইঁদুরের ওপর সাফল্য পেয়েছেন। ২০০৫-এ একটা প্রোজেক্ট শুরু হয়েছে যাতে সুপার কম্পিউটারের সাহায্যে প্রথমে ইঁদুর শ্রেণির ও পরে মানবোপযোগী ব্রেন তৈরির চেষ্টা চলছে। তাই ২০৫০-এর আগেই আমরা হয়তো পেয়ে যাব ইলেকট্রনিক চিপ দিয়ে তৈরি কৃত্রিম মেমারি।

এবার আসা যাক উপন্যাসের আরেক প্রযুক্তিতে। বর্তমানে ২০০০-এর মতো

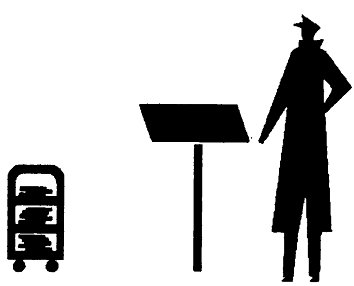
জেনেটিক টেস্ট ব্যবহৃত হয়। ভবিষ্যতে সনাক্ত করণের জন্য ও অপরাধ কমানোর জন্য এটাই হবে সবথেকে বড় হাতিয়ার। বর্তমানে ম্যালেশিয়াতে আড়াইকোটি ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে যা RFID প্রযুক্তিতে কাজ করে। চিন সরকার চিনের সব জনসাধারণের জন্য RFID নির্ভর কার্ডের ব্যবস্থা করছে।

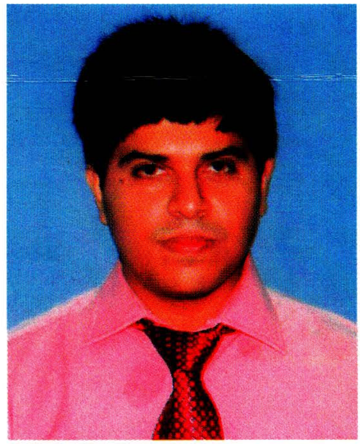
এই কার্ডে সেই লোকটার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য থাকবে। ধর্ম, উপজাতি থেকে শুরু করে তার শারীরিক অবস্থা পর্যন্ত। ভবিষ্যতে ট্রেন স্টেশন, শপিং মল, এয়ার পোর্ট, খেলার মাঠ সর্বত্রই RFID সেনসর থাকবে যার মাধ্যমে কে কবে কোথায় যাচ্ছে সবই বোঝা যাবে। এরাই হবে সরকারের চোখ আর কান।

চোখের মনি, ভয়েস, মুখ, হাতের সব আঙুলের ছাপ সনাক্তকরণে ব্যবহৃত হবে। তবে এ সবে ভুল সনাক্তকরণের সামান্য (0.1 শতাংশ) হলেও সম্ভাবনা থাকে। একদম নির্ভুল সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হবে জেনেটিক মার্কারের ভিত্তিতে তৈরি কার্ড। দশবছরের মধ্যে মোটে পঞ্চাশ হাজার টাকায় পুরো ডিএনএ সিকোয়েন্সের মার্কার বা বৈশিষ্ট্যর ওপর নির্ভর করে এরকম আইডি কার্ড তৈরি করা যাবে। অপরাধীকে পাকড়াতে এই কার্ডই হবে প্রধান হাতিয়ার।

এবার ব্রেন ফিঙ্গারপ্রিন্টিং-এর কথায় আসা যাক, এ হল লাই ডিটেকটারের পরের ধাপ। সরাসরি মস্তিষ্কের মধ্যের ব্রেনওয়েভ দেখে এ যন্ত্র বলে দেবে মনের কথা। তাই মিথ্যে বলার কোনও উপায় থাকবে না।

উপন্যাসে যে ক্লোনিং টেকনোলজি-র ব্যবহার আছে, ভাইরাস তৈরিতে ন্যানো রোবটের ব্যবহারের ইঙ্গিত আছে—তাও আমরা ২০৫০-এর অনেক আগেই পেয়ে যাব। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার আর অপব্যবহার এ দুইয়ের রেসে যে জিতবে সেই ঠিক করে দেবে আগামী দিনের সমাজের রূপরেখা। শেষ হাসি হাসবে কারা—ডি'সিলভা-রা নাকি আমরা?





জন্ম ১৮ এপ্রিল ১৯৭০, কলকাতায়। হিন্দু স্কুল থেকে মাধ্যমিকে, উচ্চমাধ্যমিকে প্রথমদিকে স্থানাধিকার, বিজ্ঞান শাখায় প্রথম। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক। পরেও পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন, পেয়েছেন দেশবিদেশের নানান ডিগ্রি। বর্তমানে উচ্চপদে কর্মরত। কর্মসূত্রে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড—নানা দেশে দীর্ঘদিন থেকেছেন।

লেখালেখির শুরু ১৯৯৪-এ কিশোর ভারতী ও আনন্দমেলার পাতায়। লেখার বিষয় প্রধানত বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান-রহস্য। পত্র ভারতী প্রকাশিত বই ঃ গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ কেমন করে কাজ করে যন্ত্র ১ম, ২য়, ৩য়; দেশ বিদেশের সেরা কল্পবিজ্ঞান; সারা বিশ্বের সেরা রূপকথা, ১ম, ২য়; এই পৃথিবী একশো বছর পরে ইত্যাদি।

প্রধান নেশা—কল্পবিজ্ঞান ও রহস্যকাহিনি লেখালেখি, বিজ্ঞান চর্চা।

প্রচ্ছদ **সুদীপ্ত দত্ত**

রহস্যময় সংকেত, ব্রেন সার্জারি, ক্লোনিং,
অদ্ভুত ধরনের কিছু প্রাণী,
আমাজনের জঙ্গলে রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেঞ্চার—
—সব মিলিয়ে জমজমাট রোমাঞ্চ।

এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো
দু-দুটি কল্পবিজ্ঞান রহস্য উপন্যাস



9788183740692
www.bookspatrabharati.com